Regd No. C-1556.

ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ

প্রথম বর্ষ

অরুণা

৬ষ্ঠ, ৭ম ৮ম সংখ্যা

(মাসিক পত্রিকা)

১৩৩৩ সাল

"নূতন প্রীতি [illegible]রে নীতি
কুমারী [illegible]া অরুণা
হবে তরুণা ?"

রবীন্দ্রনাথ—

বার্ষিক ১৲

নগদ ।/৫

সম্পাদক—শ্রীপ্রভাত কুমার চৌধুরী।

২৫

সূচী

ফাল্গুন

সূচী

চৈত্র

বৈশাখ

সূচী

অরুণা

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম ।"

প্রথম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৩৩ [ষষ্ঠ সংখ্যা

ভক্তি ও ভগবান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমৃত লাভ করিতে পারিলে মরণশীল জীব অমরত্ব লাভ করিতে পারে; কিন্তু এই অমৃতের সন্ধান দিবে কে? সামান্য কীট হইতে ইন্দ্র, চন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই স্ব স্ব পদগরিমার দ্বারা এ অমৃতের সন্ধান দিতে পারেন না, কারণ সকলেই মৃত্যুর করতলগত, মায়ার ক্রীড়ণক! তাই, যিনি নিখিল বিশ্ব-বিধাতা, আনন্দের, শান্তির, করুণার পূর্ণতম আধার, সেই দয়াল অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া জগতে জানাইলেন।

'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।'

শ্রীভগবচ্চরণে যে বিমলা ভক্তি, তাহাই অমৃত পদবাচ্য;—যাহা লাভ করিলে জরা, মরণ, শোক, দুঃখ সকল অনর্থ, মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যায়। মরণশীল জীব যদি ইচ্ছা করে, তবে এই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, পলকমাত্রে যুগযুগান্তের সঞ্চিত অশান্তির বিলোপ সাধন করিতে পারে কিংবা ভগবদ্বৈমুখী হইয়া কেবলমাত্র ধন, জন, পুত্রপরিজনকেই শ্রেষ্ঠসম্পদ ভাবিয়া অহরহঃ জ্বালাময় সংসারানলে দগ্ধ হইতে থাকে!

ভক্তিসাধনাঙ্গের—শ্রবনাদি যে কোনও একটী একান্তভাবে আশ্রয় করিলে জীব যে ধন্য হয় ইহা

অতীব সত্য কথা; কিন্তু সংসাব-বদ্ধ জীবেব পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝিবাব চেষ্টা কবিতে হইবে।

'চালাকির দ্বাবা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না'—ইহা মহাজনের পবিত্র বাক্য! প্রাণহীন, আন্তবিকতা শূন্যভাবে কোন কার্য্যেব সাফল্য-লাভ সম্ভবপব হয় না। এমন মায়াহত জীব জগতে যথেষ্ট আছেন. যাঁহাবা অনেক কথা জানেন, মুখে শাস্ত্রবচনেব অনর্গল ফোয়াবা ছুটাইয়া লোককে স্তম্ভিত কবিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ কবেন, আবাব এরূপ ভাগ্যহীন জীবেবও জগতে অভাব নাই, যাহাবা কোন কথা বুঝিতে চাহে না কেবল নিজেব আহাব বিহাব সুখসম্পদ লইয়া জীবন অতিবাহিত কবিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই উভয়েব মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? পূর্ব্বেব অবস্থাপন্ন পণ্ডিত-নামধাবী, এবং শেষেব আত্মজ্ঞান হীন অজ্ঞ ব্যক্তি, ইহাবা উভয়েই কি সমান ভাগ্যহীন নয়? উভয়েব মধ্যে কেহ, পাবত্রিক কল্যাণ দূবেব কথা, সামান্য ঐহিক যন্ত্রণাটুকুও নাশ কবিতে পাবে না। নিগ্রহেব অধিকাবে প্রাণহীন মুখস্ত-বিদ্যা কিম্বা পবিপূর্ণ অজ্ঞতা উভয়েবই সমান আসন!

শ্রীভগবানেব পবিত্রনাম কীর্ত্তন, লীলাপ্রবণ প্রভৃতি শ্রদ্ধায, আশ্রয় কবিলে জীবেব অনন্তকালেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, কষ্ট নিবাবিত হইবে সত্য, কিন্তু সেই পথে অগ্রসব হওয়াত মাযামুগ্ধ জীবেব স্বাভাবিক নয়! সে চায় ধন, জন, সে চায অহঙ্কার, গৌরব প্রতিষ্ঠা, যাহাব শেষ ফল শুধু হাহাকাব এবং অবিবাম অশ্রুপাত! যদি বা জীবেব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপুণ্যেব ফলে অনন্ত-প্রেমাধাব মঙ্গলময়েব প্রতি মনোনিবেশ কবিবাব ক্ষণিক বাসনা জাগে, তাহা হইলেই বা কি হইবে? আমাদেব সুদীর্ঘ জীবনকালেব মধ্যে এরূপ বাজে সময় পাই না, যে সময় তাঁহাকে স্মবণ কবিয়া উঠিতে পাবি! অমব ভক্তকবি তাহাই না দুঃখেব সঙ্গে গাহিয়াছেন 'হবি তোমায় ডাকবো আমাব সময় কৈ?' আমাদেব যে সময় নাই; খাইতে, শুইতে, পবনিন্দা, পবচর্চ্চা কবিতে, নিজেব সুনাম, বিত্তাদি অর্জ্জন কবিতেই যে সময় যায়! ভগবানকে ডাকিব কখন? আমাদেব অবস্থা এইরূপ হইলেও আমাদিগকে স্মবণ বাখিতে হইবে—এত সব ব্যাপাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আমাদেব জয় জযকাব নব—ইহা আমাদেব বেয়াকুবিবই নামান্তব।—মূর্খতাবই চবম নিদর্শন। তবে অল্পেব জন্য অসীম সম্পদ, ক্ষুদ্রেব জন্য মহৎকে নাশ কবাই যদি বুদ্ধিমত্তাব পবিচায়ক হয় তবে সেই সূত্রে আমবাও অতুলনীয় বুদ্ধিমান! নতুবা তাহাবও সম্পূর্ণ বিপবীত! যে ব্যক্তি, যে দ্রব্যেব আস্বাদ কখনও পায় নাই, সেই দ্রব্যেব জন্য তাহাব ব্যাকুলতা কিম্বা স্পৃহাও জন্মায় না। আমবা যে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্বৈমুখী, তাহাব কাবণ আমবা বহুদিনেব সঞ্চিত আবিলতা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত বুঝিতে পাবি না—আনন্দঘন শ্রীসচ্চিদা-নন্দেব মধুময় আশ্রয়লাভ কবিতে পাবিলে জীবেব কি অসীম অনির্ব্বচনায সম্পদ লাভ হয়!

যদি কোন ও ভাগ্যবান সেই অন্তবতম দেব-

তার কণামাত্র স্নেহ, ভালবাসা, করুণা, শুভানুধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনিই জানেন তাহা কত মধুর কত তৃপ্তিকর! সে সুধার স্বাদ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন না;. সেই অমৃত-মহিমা তাঁহার 'জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে' হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; এবং সেই সুধার অতৃপ্তিও তখন উত্তরোত্তর সেই ভাগ্যবানকে ভগবৎ সঙ্গ-লাভের অবসর আনিয়া দেয়।

সাংসারিক জীবের একটী ভীষণ দুর্ণাম--সে স্বার্থান্ধ। কিন্তু ইহা কি সত্য? মনে হয় হতভাগ্য বিনাকারণেই এই কলঙ্ক-ভার বহন করিয়া আসিতেছে! কারণ, জীব, কোথায় তাহার স্বার্থ তাহা যদি বুঝিতে পারিত, সেই পরিপূর্ণ স্বার্থে অন্ধ হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার এই দুর্দ্দশা প্রতি মুহূর্ত্তে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইত না; মনে হয় দুর্ণামের পরিবর্ত্তে, সে সকল সুনামের শ্রেষ্ঠ যাহা, সেই গৌরবে ভূষিত হইয়া অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হইত।

যিনি রাজকর্ম্মচারী, অণুমাত্রও যাঁহার বিশ্রাম নাই, তিনি যদি বুঝিতে পারেন, অতীব বিস্বাদ, রসনার অতৃপ্তিকর এই ঔষধটী নিয়মিতভাবে খাইলে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, তাহা হইলে দেখা যায়, তিনিও, তাঁহার দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যেও সেই ঔষধটী গ্রহণ করিতে থাকেন, নিয়মিত সময়ের কণামাত্রও ব্যতিক্রম হয় না! নশ্বর শারীরিক উন্নতি কামনায় যাঁহাদের এত মনোযোগ এত প্রাণঢালা প্রচেষ্টা, তাঁহাদের অন্তর যদি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিত বিপুল শান্তি, নিখিল আনন্দের নির্ঝর সেই উপেক্ষিত বিশ্ব-নাথেরই রাতুল চরণযুগলে, তাহা হইলে মনে হয় স্বরূপে প্রবুদ্ধজীব নিজের কর্ম্মবহুল দিনান্তেও সেই জগৎপ্রভুকে ডাকিয়া তাঁহার করুণা-আলোকে প্রাণের পুঞ্জীভূত অশান্তি-তমসার বিলয় সাধন করিত! কিন্তু সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; সামান্য ব্যাধির আক্রমণে ভীত হইয়া যাহারা ঔষধাদির সাহায্য লইতে ব্যস্ত, তাহারাই কিনা মরণভয় নিবারণের মহামন্ত্র লাভ করিয়াও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহেলাপরায়ণ! সেই মহা-রত্নকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে! তাহাই বলিতেছিলাম,—জীব তাহার স্বার্থ চিনে না, ব্যর্থতাই তাহার জীবনের সম্বল হইয়াছে!

জীব যদি তাহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে —সংসারের আয় ব্যয়, মান মর্য্যাদা প্রভৃতির চিন্তাতেই নিজেকে নিমজ্জিত রাখিলে, ঈপ্সিত বস্তু কখনও লাভ হইবে না; যাহা হইবে, তাহা নকল,---প্রবঞ্চনাময়; কিন্তু এ সকল ব্যতীত এমন একজন আছেন, যিনি জীবের আত্মীয়তম, নিকটতম, পরম স্নেহনিধি, আনন্দের অফুরন্ত নির্ঝর! তাঁহাকেই আপন করিবার জন্য জীবকে অন্তরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ রাখিতে হইবে।

আমাদের ন্যায় সাংসারিক জীবের পক্ষে, সর্ব্বদার জন্য এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তথাপি মনে হয় আমরা, আমাদের যাহা পরম শ্রেয় এবং প্রেয় তাহা যদি হৃদয়ের সঙ্গে বুঝিতে পারি, সেই অপার্থিব মহারত্নের প্রতি

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই, তাহা হইলে যতই আমাদের সময়াভাব হউক না কেন, দিনান্তে ক্ষণেকের জন্যও সেই পরম দয়াল পরমেশ্বরের চিরপবিত্র চরিত্রাদি শ্রবনকীর্ত্তনে মনকে নিয়োগ করিতে পারিবই--আসলে থাকা চাই শ্রদ্ধা! তাহা হইলে সকল ওজর আপত্যাই আর চলেনা।

সেই জন্যই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া।'

সকলের আগে জীবের শ্রদ্ধার প্রয়োজন। কারণ শ্রদ্ধা না থাকিলে সেই সঙ্গে আন্তরিকতারও অভাব হয়। ক্রমশঃ।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

পান্থশালা

চলিয়াছি সীমাহীন ধরি সরণী,
গোধূলি আইল চলি মুখে রজনী;
চারিপাশে সুবিশাল ঘিরি বনানী,
জলধির গরজন অদূরে শুনি।
নীলপটে আঁকা দেখি সোনা নগরী—
কোন্ রাজা থাকে সেথা কোন্ সে পুরী?
শাখী যত ভরপুর বন কুসুমে;
কোন্ সে অজানা ভাব পশে মরমে?
ঝাঁকে ঝাঁকে বসি কত বিমান-পাখী,
দলে দলে মৃগচরে সারস শিখি।
কেহ ধায় কেহ গায়, পশিছে নীড়ে;
মোর শুধু নাই বাধা চলেছি দূরে।
আঁধার আইল ক্রমে ঘিরি ধরণী
নাই শেষ অন্তহীন মোর সরণী;
তবু আমি:চলিয়াছি সরণী-শেষে
কতদূর! চক্রবালে রয়েছে মিশে।

আর ত' চলে না পদ শ্রান্ত দেহ
শ্রান্ত পথিকে বাসা দিবে না কেহ?
কোথা জনপদ কিছু মিলেনা দিশা
চলিলাম বিশ্রামের ছাড়িয়া আশা;
ওই হোথা আলো জ্বলে ওইত দূরে,
নিশ্চয় জ্বলিছে তাহা কোন, সে পুরে।
ছুটিলাম লক্ষ্য করি অতীব বেগে,
অবশ্য সেথায় কেহ রয়েছে জেগে।
আসিলাম যবে তার অতি নিকটে
দেখি এক পান্থশালা সাগর-তটে।
শীর্ষে তার দীপ জ্বলে জানাতে লোকে
তাহার অস্তিত্ব হেথা দেখিয়া চোখে,
ঢুকিলাম দ্বার দিয়া ভিতর দেশে,
বন্ধ হইল দ্বার আপনি শেষে।
প্রাচীরের গায় দেখি বড় আঁখরে—
একি লেখা আছে দেখি প্রাণ শিহরে;—

"চিরবিশ্রামের এই পান্থশালা,
তিষ্ঠ পথিক হেথা ভুলিয়া জ্বালা।
প্রবেশের আছে পথ, নিগমের নাহি।"
তবে'ত মুকলি শেষ ডাকিনু ত্রাহি

চাহিলাম চারিপাশে অছে'ত সবি
ধরণীর যত কিছু পূর্ণ ছবি ;
নাই কিছু চলিবার কোন সরণী
এমন হইল শেষ আজি রজনী।

সেখ মোজেশ্বর হোসেন।

ভাই ভাই

(গল্প)

বেলা দশটার সময় অটলবিহারি বেড়াইয়া আসিলেন। তাঁহার পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী তখনও মেঝের উপর শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়া বলিলেন—কি হ'য়েছে গো! এখনও যে শুয়ে আছ, আজকি আমাদের অরন্ধন ?

স্বামীর বিদ্রুপের কোন উত্তর না দিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী বলিলেন,—হ্যাঁ গো! সত্যই কি তবে আমাকে এঘরে রাঁধতে হ'বে ?

অটলবিহারী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এঘরে কেন ?

"তবে আর ঘর কই ? আমাদের যে ভিন্ন করে দিয়েছে।"

অটলবিহারী আরও বিস্মত হইয়া বলিলেন—ভিন্ন! সেকি ?

জ্ঞানদাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ওগো হাঁ—হাঁ—ভিন্ন। আমরা বসে বসে খাচ্ছি, তাই তোমার স্নেহের ভাই আমাদের ভিন্ন করে দিয়েছে।

অটলবিহারী পত্নীর উপর ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন—দেখ বড় বৌ, আমরা যে দু'ভায়ে বেশ মিলে মিশে চলি এটা কি তোমার ইচ্ছা নয় ? আজ কদিন হতেই আমি একথা একটু আধটু শুনে আস্‌ছি—কিন্তু ত'াতে কান দিই নাই। আর ত তা' পারিনা। তোমার যদি কোন অসুবিধা হয়, তবে বল—তোমার ইচ্ছামত স্থানে আমি তোমাকে রেখে আসছি।

স্বামীর এ তিরস্কারে, জ্ঞানদাসুন্দরী লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তিনি আর কিছু না বলিয়া স্নান করিতে কূপের দিকে চলিয়া গেলেন। অটলবিহারীও স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গায় চলিলেন।

কনিষ্ঠ রাধাচরণ এখন যথেষ্ঠ উপার্জ্জন করিতেছেন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ অটলবিহারী বৃদ্ধ বয়সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া তিন বৎসর হইল একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। অগ্রজের সঞ্চিত সাতটী কন্যার দায় হইতে মুক্ত হইয়াও যখন রাধাচরণ নিজের কোন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না

তখন অটলবিহারী চেষ্টা করিয়া কনিষ্ঠের একটা সদুপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরেই বার্দ্ধক্য বশতঃ নিজের কার্য্যটী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃবধূ কালিদাসীর তাহা আর সহ্য হইল না। স্বামী উপার্জ্জন করিবেন আর তাঁহার নিষ্কর্ম্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরটী সপত্নীক বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিবেন এটা কখনই সহ্য করা যায় না। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী তাই স্বামীকে অহরহঃ সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে আজ সেই সদুপদেশের ফল ফলিয়াছে। আনন্দাতিশয্যে ছোট বৌ আজ তাই স্বহস্তে রন্ধন করিতে গিয়াছেন। রান্নাঘরে আঁচ লাগিলে যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এতদিনে স্বামীর সুমতি হইয়াছে দেখিয়া আজ তিনি দ্রৌপদীর আগ্রহ লইয়া রান্না করিতে বসিয়াছেন। আনন্দের কথা নয় কি?

স্নান সমাপন করিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী রান্নাঘরে যাইয়া দেখিলেন কালিদাসী ভাতের ফেন গালিতেছেন।

"তুই কি ওসব পারিস বোন। ছেলেটা কাঁদছে—একটু দুধ দেগা। আমি এদিকের সব করছি—" বলিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী যায়ার নিকট গেলেন।

কালিদাসী তাড়াতাড়ি বাধাদিয়া বলিলেন—'না গো না, আমি পারবো। তুমি তোমার কাজ দেখগে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!' জ্ঞানদাসুন্দরী রাগ করিলেন না, বলিলেন—কখনও একাজ করিস নি। ভোগের শরীর অসুখ করবে যে বোন।

কালিদাসী তাহাকে চোখ ঘুরাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—পরের সুখ সবাই দেখে। সবাই কাজ করে আর আমি বসেই থাকি। এক চোখো লোক হিংসাতেই ফেটে মরে!

কথাটা সত্য হইলেও জ্ঞানদাসুন্দরী তাহা মনে করিয়া বলেন নাই। কালিদাসীকে তিনি ভগ্নির মতই ভালবাসিতেন বলিয়া স্নেহাধিক্য-বশতঃই বলিয়াছিলেন। যায়া তাহার কদর্থ ধরিয়া লইলেন দেখিয়া তিনি জিহ্বা কর্ত্তন করিলেন। তখনও হলুদবাঁটা হয় নাই দেখিয়া মসল্লার 'টোকা'টা নামাইয়া লইয়া বলিলেন—দুর্গা, দুর্গা! অমন কথা বলিসনে কালি! বড় ব্যথা লাগে।

"ব্যথা লাগলে এখানে না এলেই হয়" বলিয়া ছোট বৌ ভাতের হাঁড়ি নামাইলেন। যায়ার হস্তে মসল্লার 'টোকা' দেখিয়া তিনি একবারে লাফাইয়া উঠিলেন—"ওরে আমার সুসারি দিদিরে, অত সুসারে আমার কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি জ্ঞানদাসুন্দরীর হাত হইতে এঁটো হাতেই মসল্লার টোকা কাড়িয়া লইলেন। জ্ঞানদাসুন্দরী কিছু বলিলেন না। যে ছোট বৌ সংসারের কিছু জানিত না তাহার এইরূপ পাকা গৃহিণীর মত চালচলন দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন।

কালিদাসী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন—"হুঁ, তা এঘরে কেন? নিজের ঘরে যাও না। আমিত ডাকিনি। কেন মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ছেলেপিলের ভাতে নজর দিচ্ছ।"

জ্ঞানদাসুন্দরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ঘৃণায় ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। নরক

বিস্ফারিত করিয়া কালিদাসীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কালিদাসী তাহাতে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"নির্গুণ সাপের কুলোর মত ফনা। নিমুরাদে মাগের আবার চোখ রাঙ্গানি দেখ।"

এত বড় কথা! জ্ঞানদাসুন্দরী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কালিদাসী বিদ্রূপ করিয়া উঠিলেন—দেমাক দেখে বাঁচিনে।

অটলবিহারী তখন সবেমাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় জ্ঞানদাসুন্দরী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ওগো তোমার পায়ে পড়ি। তুমি একটা চাকরীর চেষ্টা দেখ। আমি সব সহিতে পারি তোমার অপমান কিছুতেই সহিতে পারব না। আমি দোষ করলে তুমি আমার মুখ দেখো না। তোমার বড় দিব্য রইল যদি চাকরী না কর। তোমার মুরাদ তুলে কথা বলা, তুমি বেঁচে থাকতেই আমাকে শুনতে হ'লো!

অটলবিহারী কোন কথা বলিলেন না; বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। জ্ঞানদাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—ওগো তুমি আমার দেবতা, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও তোমার কথা ঠেলতে পারিনা। তোমার কথায় সব অপমান ভুলে রাঁধিতে গেলাম আবার অপমানিত হ'য়ে ফিরে এলাম। কিন্তু এ অপমানের কথা যে সহ্য হয় নাগো—'আমি নিমুরাদের মাগ'—হরি হরি এ কথা শুনেও আমি বেঁচে আছি!

স্বামীর অপমানে জ্ঞানদাসুন্দরী কাঁপিতে কাঁপিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িলেন। অটলবিহারী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অটল বিহারী প্রত্যহ ঘোষেদের বাড়ী দাবা খেলিতে যাইতেন আজও তাই গিয়াছিলেন। রাধাচরণ সেই সুযোগে স্ত্রীর শিক্ষামত ভ্রাতৃবধূকে বলিয়া দেন—"রোজ রোজ আর ঝগড়া করতে পারি না বড় বৌ। আজ হ'তে আমাদের সব ভিন্ন রান্না হবে। আজকার মত তোমরা তোমাদের বারান্দাতেই রাঁধবে।"

জ্ঞানদাসুন্দরী তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—"আমাদের আর কে আছে ঠাকুরপো, যে আমাদের ভিন্ন করে দিচ্ছ? তোমরাই ত আমাদের সব। আমাদের যা কিছু সব মিনু ও বিনুর।"

কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। স্ত্রীর শিক্ষামত রাধাচরণ তাহকে দশকথা শুনাইয়া দিয়া অগ্রজের আগমনের পুর্ব্বেই বাড়ী হইতে চলিয়া যান। তাহার পর আহারের সময় চোরের মত বাড়ী আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করেন। আহার করিতে করিতে স্বামী স্ত্রীতে অনেক গবেষণা হইল। আহার শেষ করিয়া রাধাচরণ হাসিতে হাসিতে আচমন করিতে চলিলেন। এমন সময় অটল বিহারী আসিয়া বলিলেন—হাঁারে রাধু,

তুই নাকি আমাদিগকে ভিন্ন করে দিয়েছিস। অটলবিহারী তখন জলস্পর্শ করে নাই। তাঁহার চক্ষু রক্ত বর্ণ। রাধাচরণ তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অগ্রজের এই আকস্মিক প্রশ্নে থতমত হইয়া আমতা আমতা করিতে করিতে বলিলেন—হাঁ—তা—সকলেরই ইচ্ছা তাই। আমিও তাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ অটলবিহারী এত অপমানের উপর এত বড় শোক কখনও পান নাই। যে রাধাচরণকে আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর লালনপালন করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার যে ছোট ভাই তাঁহার একটী কথারও প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই সেই রাধাচরণ কিনা অম্লান বদনে তাঁহাকেই মুখের উপর নিঃসঙ্কোচে এত বড় কথা বলিয়া ফেলিলে! বৃদ্ধ আর কি বলিবেন? এত বড় ক্রোধে আত্মহারা হইয়া হয়ত ভ্রাতাকেই অভিশাপ দিয়া ফেলিবেন। তাহার ফল নিঃসন্তান অটলবিহারীকেই ভোগ করিতে হইবে। এই ভয়ে তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। মাতালের মত টলিতে টলিতে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। "এই বৃদ্ধ বয়সে এ কি শিক্ষা দিচ্ছ নারায়ণ!" বলিয়া নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর জ্ঞানদাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা ছুটা কিছু মুখে দিলে না। একবারে নির্জ্জলা উপোস করলে অমঙ্গলটা হবে কার? ওরা না হয় নির্ব্বোধ কিন্তু ফলটা ভোগ করবে কে? সহ্য করতে পারবে?

স্ত্রীর কথায় অটলবিহারীর চৈতন্য হইল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—অ্যাঁ, তাইত! একি করছি আমি? কই কি আছে দাওত দেখি।

জ্ঞানদাসুন্দরী কিন্তু এবার বিপদে পড়িলেন। আহারের কথা কাহারও মনে ছিল না। দরকারও বোধ করেন নাই। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল স্বামী আহার করেন নাই। তাহাতে স্নেহের নিধিদের অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্বামীকে আহারের কথা বলিলেন। এক্ষণে স্বামী খাইতে চাহিলে অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। কারণ ঘরে কিছুই নাই—সবই ছোট তরফে রহিয়াছে। মনে পড়িল ঘরে মাত্র কয়েকটা নারিকেল নাড়ু আছে; জ্ঞানদাসুন্দরী তাহারই কয়েকটা লইয়া একটী পাত্রে করিয়া স্বামীকে দিলেন। আধখানা নাড়ু মুখে দিতেই অটলবিহারীর মনে পড়িয়া গেল—সমস্ত দিনের মধ্যে আজ একবারও ত মিনু বিনু আসে নাই। তাই ত তাহাদের কে না দিয়া কি কখন খাওয়া যায়? তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ডাকিলেন—ও মিনু ওরে বিনু, নাড়ু খাবিত আয়।

কিন্তু কেহ আসিল না। গৃহান্তরে কেবল রুদ্ধ ক্রন্দনের ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেল না।

জ্যেঠামহাশয়ের ডাক শুনিলে যে মিনু বিনু স্বর্গে থাকিলেও নামিয়া আসে বৃদ্ধের প্রাণস্বরূপ সেই মিনু বিনুই যখন আসিল না তখন কি আর তিনি থাকিতে পারেন? "আর যে খেতে পারিনে গেনু!" তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন মর্ম্মঘাতী দুঃখের সময় বহুকাল পরে স্বামীর মুখে সেই আদরের সম্ভাষণ শুনিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

২

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মিনু দেখিল যে, সে জননীর নিকট শয়ন করিয়া আছে। জনক জননী নিদ্রা যাইতেছে তখন সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অটলবিহারী সমস্ত রাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানদাসুন্দরীর চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন। এক্ষনে নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া কাঁদিতে ছিলেন। এমন সময় মিনু আসিয়া ডাকিল—তুমি বড় দুষ্টু বড়মা, কাল আমাকে ওঘরে ফেলে এসেছিলে কেন?

জ্ঞানদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া স্নেহের নিধিকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মিনু বলিল তুমি কাঁদছিলে কেন বড়মা? জ্ঞানদাসুন্দরীর অশ্রু বাধা মানিতেছিল না প্রতিরোধ করিতে তিনি যতই চেষ্টা করিতেছিলেন ততই অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল। মিনুর কথায় আবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—নারে কাঁদব কেন! মিনু বলিল—হাঁ তাইত! তবে আবার চোখ মুছলে কেন? জ্ঞানদাসুন্দরী তখন মিনুর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—হাঁরে মিনু, আজ যদি আমি মরে যাই তবে তুই খুব কাঁদিস—না? তাহা শুনিয়া মিনু আতঙ্কে বড়মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মারব বড়মা।

বড়মা আদর করিয়া বলিলেন—খ্যাপা ছেলে! তোর বড়মা কি চিরদিনই বেঁচে থাকবে? কবে তোর বউ আসবে এসে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে। তার আগে আমরা মরে—

মিনু তাহার বড়মার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—যাও।

অতি কষ্টে ও মৃদু হাসিয়া বড়মা আবার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন—মিনু বলিল—মা বড় দুষ্টু নয় বড়মা?

বড়মা হাঁসিয়া বলিলেন—কেনরে।

মিনু বলিল—কাল তোমাদের খেতে দিল না। কত ঝগড়া করল—তোমার কাছে আমাদের একবারও আসতে দিল না। কত মারল। মিনু আর আমি কত কেঁদেছি। কাল আমার ঘুম হয় নি। না বড়মা—আমি মার কাছে কিছুতেই শোব না।

জ্ঞানদাসুন্দরী আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন বলিলেন—হাঁরে মিনু বড় হ'লে কি তুই আমাদের দুটো খেতে দিবি না?

মিনু বড়মার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল—তুমি কেঁদ না বড়মা। আমি আর মার কাছে যাব না। আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে বড়মা।

অটলবিহারী ঘুমাইতেছিলেন না, জাগিয়া ছিলেন। মিনুর গলা পাইয়া তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুগ্ধ হইয়া

ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার বড়মার কথা শুনিতেছিলেন। কিন্তু তিনিও আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বড় আদরের মিনুর ক্ষিদে পেয়েছে তিনি কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি স্থির বুঝিলেন কাল তাহার খাওয়া হয় নাই। জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে না খাইলে তাহার খাওয়া হয় না, বড়মার প্রসাদ না খাইলে পেট ভরে না। ক্ষিদে লাগিবে না? কাল যে ডাকিলেও তাহাদিগকে আসিতে দেয় নাই। একি কেউ সহ্য করিতে পারে?

অটলবিহারী তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—কাল কিছু খাসনিরে মিনু? তোদের জন্য নাড়ু রেখেছি—দাওত গো।

নূতন করিয়া জ্ঞানদাসুন্দরীর পুরাতন দুঃখ জাগিয়া উঠিল। স্বামীর অভুক্ত নাড়ু, অতিযত্নে ঢাকা ছিল, চক্ষু মুছিয়া তিনি মিনুকে তাহা আনিয়া দিলেন। নাড়ু পাইয়া মিনু মহাখুসী। বিনু নিকটে নাই, সবগুলিই সে নিতে চাহে। তাহা দেখিয়া অটলবিহারী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—ওরে সব নিসনে। বিনুর জন্য দু'টো রাখ।

মিনু বলিল—হাঁ রেখে কি হবে। সে এখনও ঘুমুচ্ছে। মা তাকে আসতেই দিবে না। আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

হাসির রেখা দুঃখের তাড়ণে মিলাইয়া গেল। অটলবিহারী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—তবে তুই চুপ করে ওকে দু'টো দিয়ে আয় মিনু! তোকে আবার দিব। কিন্তু দেখিস, যেন কেউ জানতে না পারে।

মিনু মহা আনন্দে সম্মত হইয়া কনিষ্ঠকে নাড়ু দিতে গেল। তাহার জনক জননী তখনও ঘুমাইতেছেন, বিনু কেবলমাত্র উঠিয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় মিনু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—চুপ কাঁদিসনে, মা জানতে পারবে। এইনে নাড়ু খাবি।

বিনু তখন খুসী হইয়া কান্না ভুলিয়া গেল। মিনুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। দাদার হাত হইতে নাড়ু লইয়া বিনু কেবলমাত্র কামড় দিয়াছে। এমন সময় কালিদাসী উঠিয়া তাহার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া হস্তের নাড়ু কাড়িয়া লইলেন। বিনু নাড়ু চিবাইতে চিবাইতে কাঁদিতে লাগিল। কালিদাসীর তাহাতেও তৃপ্তি হইল না! বিনুর কান ধরিয়া বলিলেন—ফের চিবুচ্ছিস, ফেলে দে হতভাগা। তা না হলে আজ তোকে কেটে দু'খানা করে ফেলব।

তাহার চীৎকারে রাধাচরণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি স্ত্রীর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হলো-গো? কলিদাসী স্বরের মাত্রা সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন—ডাইনি মাগীরা আবার আদর দেখাতে নাড়ু দিয়েছেন। ও ছেলে মানুষ ঘাটের কোলে পা দিয়ে তিন বছরে পড়েছে ও কি জানে। ওত খাবেই। বিষ নাড়ু গো—বিষ নাড়ু! মরে, যাবার ভয়ে কাল ওঁরা যা খাননি, ছেলেকে আদর করে আজ তাই খেতে দেওয়া হয়েছে। ঢের আদর দেখেছি গো ঢের আদর দেখেছি। ওঁদের মুখের জিনিষ খেয়ে

ছেলের আমার অমঙ্গল হবে না? মরে গেলে কার যাবে। আঁটকুড়ি মাগীদের সেগুড়ে বালি। পরের ছেলে দেখতে পারে না তাই বিষ নাড়ু দেওয়া হয়েছে।

তাহা শুনিয়া স্ত্রীর কেনা গোলাম রাধাচরণও কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে বলিলেন—অত করে বলো না ছোট বৌ। ধর্ম্মে সইবে না। দাদার নামে এ অপবাদ দিলে তার ফল তোমাকে ভুগতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজ মোহন মজুমদার।

আসার আশে

ওগো সুন্দর ওগো প্রিয়!
আজি কোন্ ছায়াপথে উড়িছে তোমার
রঙ্গিন উত্তরীয়!
আমি বসে আছি বাতায়ন পাশে
তব আশা পথ চাহি,
দিন বয়ে যায় রাত নেমে আসে
কই! তব দেখা নাহি!
ওগো আলোকের ছবি!
তোমার বিহনে হৃদয় গগনে
জ্বলেনা উজল রবি।
এস এস ফিরে আমার শিয়রে
ছড়ায়ে আলোক রাশি;
হিয়া, এ বাদরে বিরহ কাতর,
অধরে মলিন হাসি।
(ওগো) মোর পরাণের আলো!
মোর চিত্তের, তুমিই বিত্ত
তাই তোমা বাসি ভালো।
বিত্তবিহীন পিয়াসীর গেহে
নিত্য আলোক মালা!
কতদিন পরে আসিবে দুয়ারে
লইতে বরণ ডালা?
ক্রন্দনভরা দুনয়নে মোর
ফুটায়ে বিমল হাসি,
ওগো সুন্দর, ওগো প্রিয়!
কবে দাঁড়াবে সমুখে আসি।

শ্রীসরোজবন্ধু রায়।

আবোল তাবোল

প্রভাতীর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। কিন্তু কি লিখি তাই ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কেটে গেল, তাই যখন আমি আমাদের আবোল তাবোল ক্লাবে এসে উপস্থিত হলেম তখন দেখি যে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। আমার দেরী দেখে বন্ধুরা ত চটেই অস্থিব। একজন ত কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন। তখন কি করি, অনন্যোপায় হয়ে আসল কথাটা বলে ফেলতে হল।

বন্ধু নং ১, বলে উঠলেন—তা বটেই ত, তা আজকাল আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুর জন্য নিয়মের বাঁধনটা একটু আলগা দেওয়াই উচিত।

নং ২। আমি এ কথাটা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি।

নং ৩। কিন্তু কথা হচ্ছে কি—ভায়ার ভাবনাই সার হল, না একটা কিছু স্থির হল সেইটাই এখন পর্য্যন্ত জানা হয় নি।

এবার আমার পালা। আমি বললেম ঠিক আর হল কই। হ্যাঙ্গামা ত আর এক রকম নয়, ঐ যে কথায় বলে ভাব জোটেত ভাষা জোটে না, আবার ভাষা জোটে ত ভাব জোটে না, আর যদি দৈবাৎ দুটোই জোটে তবে আবার একটা গোলমাল বাধে—কালি, কলম, মন আর সময় নিয়ে। আমার ক্ষেত্রেও সেই রকম কি না কাজেই এতগুলো বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে লিখতে হলে কি আর দু'এক ঘণ্টার ভাবনায় চলে দাদা! এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে জন্মজন্মান্তরের সাধনা চাই, যুগযুগান্তরের অধ্যবসায় চাই, জীবনব্যাপিনী সাধনা চাই আর চাই—

নং ৩, আরে ভায়া থাম থাম আর চেয়ে দরকার নেই। সারা জীবন ধরে যদি চাইবেই তবে আর পাবেই বা কখন আর দেবেই বা কখন? তার চেয়ে এক কাজ কর দাদা, আমাদের এই আবোল-তাবোল সভার আদর্শ গ্রহণ করে, চোখের সামনে যা দেখ আর মনের সামনে যা পাও, একধার থেকে চালাতে সুরু কর। তাতে তোমার সাহিত্যের কিছু হোক আর না হোক তোমার নিজের অন্ততঃ একটা উপকার হতে পারে। মনের কথাটা কাগজ কলমে প্রকাশ করবার অভ্যাস ও সাহস হতে পারে। আর যদি সাহিত্যের বরাত ভালথাকে তবে হয়'ত তোমার ও ছাই পাঁশের মধ্যে থেকেও সে এক আধটা রত্ন পেয়ে যেতেও পারে; কেন না কবি বলেছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।"

আমি। কথাটা বল্লে বটে মন্দ নয়। তবে আসল ব্যাপারটা কি জান, গোলে পড়েছি ঐ ভাষা নিয়ে, কোন্ ভাষা যে লিখি তার ঠিক নেই।

নং ৩। কেন? বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখবে, এত অতি সহজ কথা!

আমি। আরে ভাই ঐখানেই ত গোল, আজকাল কি আর বাঙ্গালা ভাষা বললেই সেই গোল মেটে? বাঙ্গালা ভাষা কোনটা, অনেক বড় বড় পণ্ডিত মাথা ঘামিয়ে তা আজ পর্য্যন্ত বের কর্ত্তে পাল্লেন না। কেউ কেউ ত বলছেন যে আজকাল বাঙ্গালা উঠেই গেছে। তবে বাঙ্গালা বলে যা আমরা চালাচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে খাঁটী বিলিতি ভাষা শুধু বাঙ্গালার পোষাক পরান; বাঙ্গালা ভাষায় পোষাকটাই আছে, ভিতর থেকে ভাষা যেটা, সেটা একবারে অন্তর্ধান করেছে; আবার পোষাকটাও যে সব সময় খাঁটি বাঙ্গালার, তাও নয়; সেজন্যে নাকি আমরা প্রায় অন্যের দ্বারেই হাত পেতে থাকি। কাজেই হ্যাঙ্গামটা যে কত তা বুঝতেই পারছ! লেখার মধ্যে একটু সংস্কারের গন্ধ পেলে হয়; অমনি চারদিক থেকে চীৎকার উঠবে, ওরে বাপরে ভাষাত নয় যেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, দন্তস্ফুট করবার যো নেই। আপামর সাধারণে বুঝতে না পারলে সে ভাষা আবার ভাষা! আর যদি সাধারণের বোধগম্য খাস বাঙ্গলা ভাষায় লিখি তবে তার মধ্যে থেকে কত দোষই যে বের হবে, ব্যাকরণভুল—অবশ্য সংস্কৃত মতে ভুল—গ্রাম্যতা, প্রাদেশিকতা, ইতরতা এমন কি অসাহিত্যিকতা পর্য্যন্ত! গোলযোগে পড়ে' যদি রাজভাষার সাহায্য নিতে যাই অমনি প্রাণে প্রাণে স্বদেশপ্রীতির উন্মাদনা জেগে ওঠে—গেল—সব গেল, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল, শুচিতা গেল, সব গেল বিজাতীয়তার অপবিত্র অস্পৃশ্য সমুদ্রের মধ্যে আমাদের সনাতন বঙ্গভাষা চিরদিনের মত সমাহিত হল। বলি ভায়া, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! বলত এখন কোন ভাষায় লিখি।

নং ২। ভাষা! কেন ভাষা নিয়ে এত লড়ালড়ির যে কারণ কি, আমিত তা খুঁজে পাই না। আরে ভাষা মানে কি? ভাব প্রকাশ করবার একটা সঙ্কেত মাত্র ত? আমার মনের মধ্যে যে ভাবটা জেগেছে অন্যকে সেই ভাবটা আমি বোঝাতে চাই এই ভাষার সাহায্যে। ভাষার কাজ মনের ভাব এমন ভাবে প্রকাশ করা যাতে অন্যে সেই ভাবটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ভাষা সেই পরিমাণে ভাল অতএব গ্রাহ্য হবে, যে পরিমাণে সে আমার মনের ভাব অন্যের মনের সামনে যথার্থ ভাবে, অবিকল ভাবে তুলে ধরতে পারবে। কাজেই ভাষার সম্বন্ধ মনের সঙ্গে, চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে, কোন দেশের বা কোন জাতির বা কোন ধর্ম্মের সঙ্গে নয়; মানুষের মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তার ভাষারও পরিবর্ত্তন হবে এটা স্বাভাবিক। বিভিন্ন যুগের ভাব বিভিন্ন রকম হতে হবেই। কেন না বিভিন্ন যুগের মনের ভাব ও চিন্তা প্রণালী বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। জাতিভেদে, দেশভেদে, ধর্ম্মভেদে যে ভাষার পরিবর্ত্তন হয় সেও এই নিয়মেই হয়। কোন দেশের ভাষা, কোন ধর্ম্মের ভাষা, কোন জাতির ভাষা, কোন যুগে কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি? ভাষা স্বভাবের বশে তার কাজ করে যাবে।

তোমার ভাব যেমন তোমার ভাষাও তেমনি হবে, তুমি চেষ্টা করে যদি তাকে অন্য রকম করতে যাও তা হলে হয় তোমার মনের ভাব ঠিক রকম প্রকাশ করা হবে না, না হয় তোমার সে চেষ্টা তোমার অজ্ঞাতসারেই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। কাজেই যদি ভাষার পরিবর্ত্তন করতে চাও তবে আগে তোমার মনের পরিবর্ত্তন কর, তোমার শিক্ষা, দীক্ষা,চিন্তার পরিবর্ত্তন কর, তোমার ভাষা আপনি পরিবর্ত্তিত হবে, তোমাকে চেষ্টাও করতে হবে না। যে পথে তোমার মন চলবে সেই পথে তোমার ভাষাও চলবে, তাকে অন্য পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা বাতুলতা, সেটা স্বাভাবিক নয়। কাজেই লেখার সময় ভাষার জন্য ভেবে ফল নেই। তোমার মনে যদি ভাব আসে সে ভাব ঠিক রকম করে প্রকাশ করতে তুমি যে ভাষায় পার, সেই তোমার ভাষা—সেই ভাষাতেই তোমার অধিকার সেই ভাষাতেই তুমি তোমার কথা লোককে বোঝাতে পারবে, সেই ভাষাতেই তুমি জোর পাবে, সেই ভাষাতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

নং ১। তবে কি বলতে চাও যে ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই? যে কথাটা যার মনে যে ভাবে আসবে, সে কথাটা সে তেমনি ভাবে তার নিজের মনের ভাষাতেই প্রকাশ করবে—তা যদি হয় তাহলে, আমার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে সাহিত্যের রাজ্যে একটা অরাজকতা, একটা বিশৃঙ্খলতা এমন ভাবেই মাথা খাড়া করে তুলবে যে, সে ক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন হয়ে উঠবে। সবাই আপন আপন পথে চলবে, কেউ কারো ধার ধারবে না। তার ফল হবে এই, যার ভাষা, সে ছাড়া অন্যে কেউ সে ভাষা বুঝতেও পারবে না। ভাষার যদি একটা বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকে, ভাষার মধ্যে যদি যথেচ্ছাচার চালাতে দেওয়া হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী মানুষের মত তারও পতন হবেই হবে। এ কথা তুমি ভেবে দেখেছ কি?

নং ২। খুব ভেবে দেখেছি; তুমি যা বলছ সে খুব খাঁটি কথা, আমি স্বীকার করি। যথেচ্ছাচারের মধ্যে দিয়ে কখন কোন জিনিস বেশী দিন চলতে পারে না। কিন্তু আমার কথা হয়ত তুমি বুঝতে ভুল করেছ। ভাষায় যথেচ্ছাচার চালাতে আমি বলছি না। আমি চাই নিয়মের মধ্যে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এক কথা আর যথেচ্ছাচার আর এক কথা। ভাষার আদর্শ এমন একটা কিছু থাকবেই যাকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে। তবে আমি বলি তোমাদের সেই আদর্শটা যত উদার হয়, যত সজীব হয় ততই কি আমাদের ভাষার পক্ষে সেটা মঙ্গলের কথা নয়? নিয়মের পর নিয়মের কঠোর বন্ধনে যদি ক্রমশঃ তাকে এত সঙ্কীর্ণ করে তোল যে, প্রতিপদে তাকে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে চলতে হয়, তবে হয় ধাক্কা খেতে খেতে তার জীবনীশক্তি কমে যাবে, না হয় ক্রমশঃ সংকীর্ণ গণ্ডীর ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার মধ্যে দমবন্ধ হয়েই মারা যাবে। সে চেষ্টা যে বৃথা, প্রকৃতির নিয়মে সে যে সয় না! তোমরা যত সতর্কতার সঙ্গেই ভাষার অচলায়তন নির্ম্মাণ কর না কেন দাদাঠাকুরের-

দল আসবেই আসবে, তখন তোমাদের সেই আবরণের উপর আবরণের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরে তাকে উদার উন্মুক্ত আকাশের নির্ম্মল আলোকের মধ্যে টেনে আনবে, কেন না সেই যে স্বাভাবিক ঈশ্বরের বিধানে, সেই যে একমাত্র সত্য! জোর করে কেউ কাউকে চেপে রাখতে পারে না। সকলেরই সীমা আছে। তোমার সাধ্য কি তুমি সেই সীমা অতিক্রম করবে।

নং ১। বেশত তোমার সে সীমা তাহলে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলতে চাও? তোমার ভাষার আদর্শ তুমি কেমন মনে কর? কোন নিয়মে তুমি ভাষাকে চালাতে চাও?

নং ২। আমার ভাষার আদর্শ তুমি জান্‌তে চাও? আমার মতে লিখবার সময় শুধু এইটুকু মনে রেখে চল্‌তে হবে, শুধু এই নিয়ম মেনে চল্‌তে হবে যে, আমার ভাষা, বাঙ্গলা ভাষা হওয়া চাই! বাঙ্গলা ভাষা আমি তাকেই বলব, যে ভাষা আমরা--বাঙ্গালীরা আমাদের মধ্যে ব্যবহার করি যে ভাষা আমরা বল্‌তে পারি, বুঝতে পারি, সেই আমাদের ভাষা; আমরা সেই ভাষাতেই লিখব, আর তেমনি ভাবেই লিখব, যে ভাবে আমরা তার সঙ্গে পরিচিত। হতে পারে প্রাদেশিক বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার মধ্যে এক আধটুকু পার্থক্য আছে কিন্তু সে পার্থক্যে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না। ক্রিয়া পদে এক আধটু ব্যতিক্রমে বা উচ্চারণের এক আধটু বৈষম্যে ভাষার বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সকল প্রদেশের বাঙ্গালীরাইত পরস্পরের কথা বুঝতে পারে। তা ছাড়া বেশীর ভাগ লোকে যে ভাষা বুঝতে পারে, সকলেরই চেষ্টা হয় সেই ভাষা বুঝতে পারার জন্য। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা লেখায় কত রকম বিভিন্ন ভাষার ই ব্যবহার হয়েছত কিন্তু এমন কোন ভাষা দেখেছ কি, যা কোন প্রদেশের বাঙ্গালীর পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য? শুধু বাঙ্গলা কেন সকল দেশের ভাষাতেই এক আধটুকু প্রাদেশিক বিভিন্নতা দেখা যায়, আর যখন যে প্রদেশের লোক সাহিত্য ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছেন তখন সেই প্রদেশের ভাষার প্রাধান্যই সেই সব দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভাষায় uniformity না হয় নাই থাকল তাতে বিশেষ ক্ষতি কি? ভাষা সম্বন্ধে যত রকম experiment হয়, হক না কেন? সব চেয়ে যেটা ভাল, সব চেয়ে যেটা উপযুক্ত সেইটাই ত টিকে থাকবে; তুমি যেমন ইচ্ছা তেমন করে লেখ ক্ষতি নাই তবে তুমি যা লিখবে তা বাঙ্গলা ভাষা হওয়া চাই, তা বাঙ্গালীর বোধগম্য হওয়া চাই এই মাত্র।

আমি। এ যদি স্বেচ্ছাচার না হয় তবে স্বেচ্ছাচার আর কাকে বলব। ভাষা নিয়ে যদি অনবরত experiment চলতে থাকে, আর যত কেরদানী আছে সব যদি ভাষার উপর চালাতে চাই, ভাষার যদি uniformity না থাকে তবে ভাষা যে একটা খেয়ালীর খেয়ালে পরিণত হয়ে উঠবে। হাজার রকম মূর্ত্তি ধরে সে যখন তোমার কাছে এসে হাজির হবে তখন তুমি কোনটাকে তোমার বাঙ্গলা ভাষা বলবে বল দেখি।

নং ২। আমি সবগুলিকেই বাঙ্গালা ভাষা বলব।

এই যে আমাদের বাঙ্গালা দেশে এতগুলি বাঙ্গালী সন্তান দেখছ তারা কি সব দেখতে এক রকম আকারে, প্রকারে, আচারে, ব্যবহারে দুজনের মধ্যে কি মিল দেখতে পাও? অথচ আমরা অস্বীকার করব না যে, তারা সকলেই বাঙ্গালী। সেই রকম ভাষা হাজার রকমের হক না কেন, যদি তা বাঙ্গালীর ভাষা হয় তবে আমরা তাকে বাঙ্গলা ভাষাই বলব। ভাষায় uniformity কখন সম্ভব নয়। যদি বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের এই সাত কোটী লোকের মনের ভাব একই ধারায় প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয়, যদি কখনও বাঙ্গলা দেশে সমস্ত প্রাদেশিক বৈষম্যের তিরোধান সম্ভব হয়, তবেই এক রকম বাঙ্গলা ভাষা সম্ভব, নতুবা হাজার চেষ্টা করলেও ভাষা একরকম হবে না। কখনও কোন দেশে, কোন সাহিত্যে ভাষার সে রকম সমতা দেখা যায় না, আর যাবেও না; কেন না সেটা একেবারে অস্বাভাবিক।

নং ১। তবে ভাষার যথেচ্ছাচার তুমি কাকে বল?

নং ২। ভাষার যথেচ্ছাচার একথা আমি তখনি বলব, যখন বাঙ্গালীর পক্ষে সে ভাষা দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়বে। সে ভাষা দুচারজন পার্শিনবীস, সংস্কৃতজ্ঞ অথবা ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছাড়া তুমি আমি সাধারণ লোকে বুঝতে পারব না। তবেই আমি বলব ভাষার উপর জুলুম করা হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে ভাষায় যথেচ্ছাচারীতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ভাষার উপর এরকম অত্যাচার হতে পারে অনেক রকমে—দুর্ব্বোধ্য শব্দ প্রয়োগে, অদ্ভুত অর্থহীন বাক্যবিন্যাসে এমন কি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশের কষ্টকল্পিত কায়দা করতপে। বাঙ্গালা ভাষায় নূতন কথা গ্রহণ করতেও আমার আপত্তি নেই, তবে নূতন কথা প্রয়োগ করবার পূর্ব্বে বিবেচনা করতে হবে, সে কথাটা বুঝবে কয়জন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই কত নূতন বিদেশী কথা আমরা ব্যবহার করছি, যে সব কথা আমরা সবাই বুঝি, যে সব কথা প্রায় বাঙ্গলাস্থ হয়ে গেছে, সে সব কথা ব্যবহারে দোষ কি? বরং তাতে ভাষার জোর বাড়বে, ভাব প্রকাশের শক্তি বাড়বে, ভাষার উন্নতিই হবে। তবে এমন সব কথা তুমি ব্যবহার করতে পারবে না, যা তুমি বা তোমার মত দুচারজন ছাড়া আর কেউ বুঝবে না; তা সে কথা সংস্কৃতেই থাক, ইংরাজিতেই থাক আর পার্শি, আরবীতেই থাক। এই ত গেল শব্দ প্রয়োগের কথা। আবার বাক্যবিন্যাস সম্বন্ধেও এতটুকু নিয়ম মেনে চলা চাই, যে এমন বাক্যবিন্যাস তুমি করতে পারবে না, যাতে বাঙ্গালীর পক্ষে তার মানে বোঝা দুরূহ হয়ে ওঠে কেননা তা করলে আমি সেটা যথেচ্ছাচার বলব। বিদেশী ভাষাবিন্যাস প্রণালী সব সময় আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় আমদানী করতে গেলে ভাষাটা অনেক সময়েই সহজ বোধ্য হয় না। অন্ততঃ সেই ভাষায় যারা অভিজ্ঞ নয় তাদের কাছে ত সেটা একটু বেতরই ঠেকে। তারপর ভাব প্রকাশের কায়দা করতপের দিকেও একটু দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। দেশ ভেদে লোকের মনের ভাবেরও এক আধটুকু

স্বাভাবিক প্রভেদ দেখা যায়। একটা কথা এক-দেশের লোক যেভাবে বললে সহজে বুঝতে পারে, অন্য দেশের লোক হয়ত সে ভাবে বল্লে বুঝতে পারবে না অথচ সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সে দেশের লোকের মনের ভাবের অনুযায়ী করে বললেই, তাদের আর সে কথাটা বুঝতে কষ্ট হবে না। বাঙ্গাল ভাষাটা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বুঝবার জন্যই লেখা হয়। কাজেই বাঙ্গালীর মনোভাবের যে একটু বিশেষত্ব আছে, যে বিশেষ ধারায় সেটা প্রবাহিত হয়, সেদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রেখেই আমাদের কলম ধরতে হবে। ভাব, আমরা যেখান থেকেই আমদানী করি না কেন সেটাকে বেশ পোষ মানিয়ে নিজের করে নিতে হবে—যেন দেখলেই চিনতে পারি যে, এ আমাদেরই জিনিষ। তবে এ কাজটা খুব কঠিন বলেই মনে করি। কাজেই এসম্বন্ধে একআধটুকু ত্রুটিহলেই যে ভাগবত অশুদ্ধ হ'ল এমনটা আমার মনে হয় না।

আমি। দেখ একটা কথা আজি ভাল বুঝতে পাচ্ছি না। তুমিত এ পর্য্যন্ত যত কথা বলছ ভাষার উপরকার পোষাক নিয়েই বলছ। ভিতর-কার জিনিষটার যে কোন খোঁজই দিচ্ছ না। ভাষার আকার প্রকারটা কেমন সেটা জানাও যেমন দরকার তেমনি তার অন্তর্নিহিত প্রাণের স্পন্দনের ধারাটা জানাও ত দরকার। সব ভাষারই ত একটা বিশেষত্ব একটা নিজত্ব আছে। গানের কথাগুলোর মধ্যে যেমন এক একটা সুর থাকে তেমনি ভাষার মধ্য দিয়েও একটা সুরের ধ্বনি পাওয়া যায় না কি? তবে গানের সুর শোনা যায় কানে, আর ভাষার সুর ধরা পড়ে মনে। অন্তর্নিহিত সুরটা ভাষার আবরণ ভেদ করেও আমাদের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে যায় সেইটাই হচ্ছে ভাষার প্রাণের স্পন্দন। সব ভাষার সুর ত আর একরকম নয়। এক এক ভাষা এক এক সুরে বাঁধা, কেননা সেই সুরেই ত আমাদের বাঙ্গালা ভাষা লিখতে হবে। এ সম্বন্ধে কোন কথা ভেবে দেখেছ কি?

নং ২। কেন ভাবব না? এইত একটু আগেই আমি বলেছি যে বাঙ্গালীর মনোভাবের একটু বিশেষত্ব আছে, আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের কলম ধরতে হবে। মনোভাবের সঙ্গে ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ; কাজেই বাঙ্গালীর ভাষার সুরেও যে একটু বিশেষত্ব থাকবে সেটা তত আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে সুর, এটা বাজে প্রথমে বাঙ্গালীর মনে, তারপর তা আপনিই সাহিত্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। মনের মধ্যে যে সুর বাজে, লেখায় সেইটাই প্রকাশ হয়। আবার দেখা যায় তুমি বা আমি ইচ্ছা করলেই ভাষার সুর হঠাৎ বদলাতে পারি না, কেন না সেটা অনেকটা নির্ভর করে সময়-ধর্ম্মের উপর। শিক্ষা, দীক্ষা, এবং চিন্তাপ্রণালীর ইতর বিশেষের জন্যই হ'ক বা অন্য যে কারণেই হ'ক এক এক সময় এক এক জাতির মধ্যে এক এক রকম সুরের আভাস পাওয়া যায়। দুইটী জাতির অবাধ মিশ্রণ এবং ভাব বিনিময় আবার পরস্পরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে;

কাজেই পারিপার্শ্বিক ঘটনার ও অবস্থার জন্য, এবং শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তাপ্রণালীর বিভিন্নতার জন্য, এক এক সময় আমাদের মতিগতি এক এক ধারায় প্রবাহিত হয়, মনের মধ্যে এক এক সুর বাজে। কাজেই কোন ভাষার বাঁধা ধরা একটা সুর আছে কিনা অথবা থাকা দরকার কি না তা বলা কঠিন। তবে এটা যে স্বাভাবিক নয়, অন্ততঃ একথা আমি জোর করেই বলতে পারি। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, লোকের মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষার সুরেরও পরিবর্ত্তন হবেই। ব্যাস, বাল্মীকির যুগ, কৃত্তিবাস কালিদাসের যুগ, ভারতচন্দ্র চণ্ডীদাসের যুগ, আর বঙ্কিম. রবীন্দ্রের যুগ এক সুরে বাঁধা হতেই পারে না। এমন কোন ভাষা নাই যা চিরকাল একই ধারায় চলেছে। যদি তেমন ভাষা দেখতে পাও তবে নিশ্চয় দেখবে সে ভাষার উন্নতি নাই, সে ভাষা জীবন্ত নয়, মৃত। কেননা জীবনের লক্ষণ কি? — পরিবর্ত্তন। যে ভাষায় যে সমাজে এই পরিবর্ত্তন নেই—সেই অনাদি অনন্তকাল ধরে একই ধারায় প্রবাহিত—সে ভাষা সে সমাজ মৃত, তার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। অনেকে বলেন, আমরা আমাদের সেই প্রাচীন যুগের পিতৃপিতামহের ধারা ছেড়ে এখন বিদেশীর অনুকরণে মরণের পথে ছুটে চলেছি কিন্তু আমি বলি না, এ আমাদের মরণের লক্ষণ নয়; আমরা যে বেঁচে আছি এ বরং তারি প্রমাণ। যুগের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা চলতে না পরি, যদি পঙ্গুর মত এক জায়গাতেই মাটি আঁকড়ে আমাদের বসে থাকতে হয়, তবে আমাদের জীবনী শক্তি কোথায়? তা ছাড়া এ সত্য তোমাদের মানতেই হবে, যে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে এক যুগে যা উপযোগী, যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপযোগীতার ব্যতিক্রম হবে না কি? তবে কেন আমরা সেই অতীত যুগের আদর্শকে চিরকাল অন্ধভাবে অনুসরণ করে যাব? এক সময়ে যা উপযোগী ছিল এ সময়েও তা সব সময় উপযোগী, এ কথা অম্লান বদনে মেনে নেব? না, আমরা তা নেব না। কেন না আমরা মরতে চাই না, আমরা বাঁচতে চাই; আমরা পেছুতে চাই না আমরা এগুতে চাই। একথা আমরা কিছুতেই মানব না যে এক একটা জাতির মন এক একটা বাঁধা ধরা সুরে বাঁধা; আমরা বলব, যুগে যুগে আমাদের জাতীয় আদর্শের পরিবর্ত্তন হচ্ছে কাজেই যুগে যুগে আমাদের ভাষার সুর বদলাতেও বাধ্য। কাজেই ভাষার সুর নিয়ে মাথাঘামাবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। কেন না সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ মনের উৎকর্ষের উপর। ভাষাকে তার নিজের পথে যেতে দাও, জোর করে তাকে মেরে ফেল না। তাতে কিছুমাত্র শুভফলের সম্ভাবনা নেই।

আমি। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে পড়ল। আজকারমত সভা ভঙ্গ হ'ক।

৺সৌরীশ চন্দ্র মৌলিক।

বিস্মৃতি

কোন কাজেতে আমায় প্রভু
পাঠিয়ে দেচো তুমি,
এসে হেথা সে সব কথা
হারিয়ে গেচি আমি।
নই গো শুধু স্মৃতিহারা,
হারিয়েচি সব আঁধার ছাড়া,
সে, দাঁড়িয়ে পাশে বিভোর বেশে
ভুলিয়ে দেচে পথ,
অবাক আমি হতাশ আমি
ব্যর্থ মনোরথ!
কোথায় যাব কো'র্ব্বো কিগো
পাই না খুঁজে আমি,
এবার আমায় যাহোক্ ক'রে
বাঁচাও জীবন-স্বামি!

শ্রীঅভয়া পদ ঘোষ।

সমাজপতি

"বলি কিহে ঘোষাল ভায়া, চাটুর্য্যে ভায়া, দেশটায় যে আর থাকা চলে না! কি বিষম অনাবৃষ্টি, হায়রে কলিকাল! ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম গেল, জাত গেল, বাপ পিতা'মোর পিণ্ডি লোপ হ'তে বসলো—শিব! শিব!" ইত্যাদি আক্ষেপের সঙ্গে তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রকাণ্ড গড়গড়ার নলে টানদিয়া একটা ছোটখাট আগ্নেয়গিরির ধূম সৃষ্টি করিয়া যেন নিজের ভিতরের আগুণেরই মাত্রাধিক্য জানাইলেন।

বীরভূম জেলার রামপুর একটী গণ্ডগ্রাম;

এখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ও অনেক ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর বাস। অন্যান্য জাতির সংখ্যা বেশী হইলেও ত্রিশ চল্লিশঘর ব্রাহ্মণেরই ইহা খাসদখলে। তাঁহারাই পুরুষ পুরুষানুক্রমে এ গ্রামের প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; তবে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়েরই প্রবল প্রতাপ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে হাতাবেড়ী-সার হইলেও তারিণীশঙ্করকে লক্ষ্মীদেবী একেবারে অকৃপা করেন নি। একে—ব্রাহ্মণ, তাহাতে কুলীন, তাহাতে আবার ঘরে খাবার! —আর কি চাই? একেবারে ত্রিধারাসঙ্গম—প্রয়াগতীর্থ! তাই এই সচল প্রয়াগের কৃপালাভ করিবার জন্য রামপুরের অনেকেই লালায়িত ছিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার স্থান—মহামান্য তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়েরই অর্দ্ধসজ্জিত বৈঠকখানা, কাল,—সায়াহ্ন; ও পাত্র—মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই কৃপাপ্রার্থী গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ। ঘোষাল, চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গুষ্ঠবুদ্ধি বন্ধুগণ এ গৌরচন্দ্রিকার মূল কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তবে তাঁহাদের গোব্যপুষ্ট-মস্তিষ্ক এটুকু বুঝিতে পারিল—মুখোপাধ্যায়ের যতকিছু অনাসৃষ্টির দায়ী হইবার জন্য কোন ভাগ্যবানকে যথাশীঘ্রই প্রস্তুত হইতে হইবে।

"বলি ভায়াদের যে আর মুখে কথা নাই! হজমি টজমি খেয়েছ নাকি?"

"আঁজ্ঞে আপনি একথা বলছেন! আমরা এতবড় অপমানটা হজম করে ফেলবো একথা স্বপ্নেও ভাববেন না; প্রতিকার চাই-ই চাই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যতক্ষণ না এর একথা ব্যবস্থা হয়, ততক্ষণ আর জলস্পর্শ করবো না।" এই বলিয়া মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ঘন ঘন মস্তক আন্দোলনে ও ভ্রমরশুভ্র (?) যজ্ঞোপবীতের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন।

ইহার পর গুপ্তপরামর্শে কয় ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না; তবে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় যখন মুখোপাধ্যায় গৃহিণীর তাড়াহুড়িতে ভৃত্য আসিয়া খাবার প্রস্তুত জানাইল, তখন সমাজপতির জ্ঞান হইল।

"হাঁ তাহ'লে বুঝলে ভায়ারা! সব সাবধান; সেই কথাই ঠিক থাক্‌লো। তা না হ'লে, আমারা উপযুক্ত বংশধর থাক্‌তে যদি এসব অনাচার অত্যাচার হয় তা'হলে মনু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি সকলেমিলে যে অভিশাপটা দিবে তা যেন মনে থাকে—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

হরিহে দয়াময়! শিব, শিব, দুর্গে; দুর্গতিনাশিনি! —যাই সায়ংসন্ধ্যাটা সারিগে!"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল; সকলে ভক্তিনত মস্তকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ীরমুখে চলিলেন।

২

ইহার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়াছ; একদিন মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি দ্বিপ্রহরের ভীষণ শীত ও ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া একখানি গরুর গাড়ী ধীর মন্থরগমনে আসিয়া রামপুরের

মধ্যস্থ একখানি দ্বিতল গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্য হইতে একটী পুরুষ একটী বালিকার হাত ধরিয়া নামিল, পিছনে একটী সদ্যবিধবা, আলুলায়িত বেশে ছুটিয়া আসিয়া গৃহের দ্বারে লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তাঁহার সমবেদনাভাগী সেগ্রামে বোধহয় কেহ ছিল না, তাই কতকগুলি শৃগাল কুকুর একবার কাঁদিয়া উঠিয়া মানুষের বাকী কর্ত্তব্যটুকু শেষ করিল। অভাগিনী দুয়ারে বসিয়া কতক্ষণ কাটাইলেন কিন্তু আরত তাঁহার এরূপে থাকা চলে না! পার্শ্বে বালিকাটী কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিহার-সিক্ত কুমুদিনীর মত প্রভাতের আগে ঘুমে লুটাইয়া পড়িতেছে। মাতৃত্বের স্রোতে শোক দুঃখ সব ভাসিয়া গেল; তিনি উঠিয়া শূন্য-পুরে প্রবেশ করিলেন। দেবতা বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যমণ্ডপে প্রাণ আবার কাঁদিয়া উঠিল; পথের ক্লেশে ক্রমে শরীরও অবশ হইয়া আসিতেছে। যিনি দেবতার দেবত্ব দেখেন না, পাপীতাপীর পাপতাপ বিচার করেন না, সকলকেই কোলে টানিয়া সকল অবসাদ দুর করেন সেই শান্তি-দায়িনী নিদ্রাদেবী অভাগী হেমপ্রভাকেও একঘরে করিয়া রাখিলেন না, নিজের কোলে টানিয়া লইলেন। হেমপ্রভা সেই রজনী শেষে নিদ্রিতা হইল।

প্রতিদিন রাত্রি শেষে যেমন আবার দিন দেখা দেয় আজও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না; বিষাদক্লিষ্ট আঁধার দ্বিতল গৃহের মাঝে ভাগ্য-হীনাকে দেখিবার জন্য অরুণ উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। হতভাগিনীকে সহানুভূতি দেখাইতে পারে রামপুরে বোধহয় এরূপ কেহ ছিল না।

প্রভাত হইল; হেমপ্রভার ভাগ্যের কথা লোকমুখে ক্ষণেকের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলে শুনিল, রায় বাহাদুর রাজীবলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই; বিদেশে, চাকরীস্থানে রাঁচি সহরেই বিসূচিকা রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজসরকারের অসীম সম্মান তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না, রামপুর ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাকে শাসন-শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিল না; তারিণী শঙ্করের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যে ঘরে স্থান পাইয়াছেন এ পতিতেরও সেইস্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিল! রাজীববাবুর মৃত্যুতে রামপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, আর দীন দুঃখী যাহারা, তাহারা একবার উপরের পানে তাকাইয়া নীরবে চোখের জল মুছিল।

৩

"ভায়ারা সব দেখলে ত? এখনও ধর্ম্ম আছেন; বামুনের ছেলের এত অনাসৃষ্টি, ছত্রিশ জাতকে নিয়ে উঠা বসা, সহ্য হবে কেন? দেখলে ত! কেমন করেই না অক্কা পেলে!—বলি বামুনের অভিশাপ! সাপের‍ও বাড়া।" ইত্যাদি টিপ্পনীর সঙ্গে তারিণী শঙ্কর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। ভোর হইতে না হইতেই ঘোষাল প্রভৃতি পাণ্ডাগণ সমাজপতির উঠানে মিলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ব্রাহ্মণত্বের কি ভীষণ

প্রভাব জানাইতে ব্যস্ত; তারিণী শঙ্করের কথা শুনিয়া সকলেই বিরাট সম্মতিসূচক দন্তবিকাশ করিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে, তারিণীশঙ্কর প্রভৃতি সমাজপতিগণের যতকিছু অনাসৃষ্টি পাত্রটী কে? এই রাজীব বাবুর দোষও অনেক রামপুর গ্রামে তিনিই একমাত্র উচ্চশিক্ষিত; তাঁহারই অর্থ ব্যয়ে ও চেষ্টায় গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; গরীব দুঃখী এখন আর ঔষধ অভাবে মরে না, আর্ত্তের জন্য তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত হস্ত। এই সকল দোষের উপর তাঁহার অমার্জ্জনীয় দোষ ছিল, তিনি তারিণীশঙ্কর প্রভৃতি গ্রামের সমাজষণ্ডগণের গোঁজামিল ব্যাপারে কখন মত দিতে পারিতেন না বরং তাহার বিরুদ্ধাচরণই করিতেন। তাঁহার দোষের অন্ত ছিল না; শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নাকি শূদ্রদেরও ছেলেদিগকে লইয়া আদর করিতে ভাল বাসিতেন এবং নিজের একমাত্র কন্যাটীকেও স্কুলে পাঠাইয়া শিক্ষাদিতেন;--কি অন্যায় ব্রাহ্মণের মেয়ের বিদ্যালাভ! নিশ্চয়ই মেমসাহেব হইবে! এ সব দোষের কোন্‌টী মার্জ্জনা করা যায়? তাহাই আজ তিন বৎসর হইল রাজীব বাবু সমাজে পতিত।

রাজীব বাবুর ইহাতে ভ্রুক্ষেপ করিবার মত কিছুই ছিল না; প্রায় সময়েই তাঁহাকে বিদেশে থাকিতে হইত, যখন মাঝে মধ্যে রামপুরে আসিতেন তখন সমাজদারগণের অনেকেই গোপনে আসিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে ভুলিতেন না, গরীব দুঃখীর ত কথাই ছিল না।

হ্যাঁ, আমরা পূর্ব্বেকার কথা লইয়া একটু পিছাইয়া পড়িয়াছি; ইহার মধ্যেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল; তারিণীশঙ্করকে অগ্রণী করিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ রাজীব বাবুর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ও অলি, অলি! একবার এদিকে আয় ত মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তারিণীশঙ্কর একেবারে অন্দরে গিয়া রাজীব বাবুর একমাত্র দশমবর্ষীয়া কন্যা অলকাকে টানিয়া বুকের কাছে লইলেন। বসিতে আসন দিয়া হেমপ্রভা ঘরের ভিতর দুয়ারের নিকট দাঁড়াইলেন; সমাজপতিদের আগমন সংবাদেই তিনি কত কি ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন; এখন তারিণীশঙ্করের সস্নেহ ব্যবহারে নীরবে কতই কাঁদিলেন। কত স্মৃতি আজ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

"আহা বৌমা! কেঁদে আর কি করবে? তোমার কপালে যে এ ছিল তা স্বপ্নেও ভাবিনি! আহা রাজীব আমার ভাইয়ের মত ছিল। সমাজের জন্য তার সঙ্গে আমার একটু মনান্তর হলেও প্রাণে প্রাণে যে আমাদের কত টান ছিল তা একমাত্র ভগবান জানেন! যাক্ যা হবার হয়েছে, এখন যাতে ভায়ার পরকালের কাজ হয় তাই করতে হবে; জগতে কিছুই ত স্থায়ী নয়!—হরি হে তোমারি ভরসা!" বলিয়া তারিণীশঙ্কর চক্ষু মুছিলেন।

হেমপ্রভা ভাবিলেন, "আহা মানুষের মতই

কথা!" অলকাকে বলিলেন—"বল অলি, ওঁরাই আছেন, যাতে তাঁর পরকালের কাজ হয় তাই করুন।" অলকার কথা শুনিয়া তারিণীশঙ্কর বলিলেন—"আহা, তা আর বলতে! এ ত বৌমার মত বুদ্ধিমতীরই কথা! বলিতে ভুলিয়াছি ইহার মধ্যেই অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ একে একে সমাজপতির আশেপাশে আসিয়া জুটিয়াছেন।

"আচ্ছা যেমন হয় বিকেলে ফর্দ্দ করে আন্‌বো; বামুনের কাজ, কলা পাকারও সময় থাকে না।—হরি হে! আহ্নিকের বেলা হলো।" বলিয়া তারিণীশঙ্কর গাত্রোত্থান করিলেন। তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

৪

বৈকালে সমাজপতিরা আসিয়া আবার হেমপ্রভার নিকট উপস্থিত হইলেন। তারিণীশঙ্করের হাতে একখানা ফর্দ্দ; অলকা ফর্দ্দ লইয়া মার হাতে দিল। ফর্দ্দ দেখিয়াই ত হেমপ্রভার চক্ষু স্থির! তারিণীশঙ্কর বলিলেন—

"বৌমা, এর কমে আর ফর্দ্দ করতে পারলাম না; অনেক কমিয়ে মাত্র ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ করেছি। আহা, ভায়া ত আমার যেমন তেমন লোক ছিলেন না। মস্ত বড় হাকিম, দেশ বিদেশে কত সুনাম; তার উপর সমাজেও একটা গোল আছে—পঞ্চগ্রামী করে ব্রাহ্মণদের প্রণামী বিদায় দিতেই হবে। এর কমে কি আর কাজ হতে পারে? তা, বিশেষ নিজের বলেই এত টানাটানি।"

সরলা হেমপ্রভা স্বামী দেবতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে ইহাতেই রাজি হইলেন; কিন্তু এখন—টাকা! তাঁহার কাছে মাত্র নগদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং সম্বল বলিতে সামান্য কিছু অলঙ্কার! হায় যেমন স্বামী, সেইরূপই স্ত্রী, তাঁহারা ত সংগ্রহ করিতে কিম্বা নিজের কথা ভাবিতে জানিতেন না! তাহা না হইলে ডেপুটীবাবুর স্ত্রীর একখানা অলঙ্কারের দামই যে আজ যথেষ্ট! হেমপ্রভা নিজের অলঙ্কার আনিয়া তারিণীশঙ্করের নিকট দিলেন।

দেখিতে দেখিতে ২৫শে মাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ শ্রাদ্ধের দিন; রাজীব বাবুর বাড়ী আর লোক ধরে না। মহা হৈ চৈ; সকল কাজেই তারিণীশঙ্কর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন;—কে বলিবে তিনি আজ দুঃখিত না সুখী? চারিটী ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ, ভুরিভোজন, কাঙ্গালী বিদায় সকল কাজই সুসম্পন্ন হইল; ব্রাহ্মণগণ আকণ্ঠ ভোজনের পর একটী করিয়া রজতখণ্ড ট্যাঁকে গুঁজিয়া, হস্তে বিদায়ী ঘড়া প্রভৃতি লইয়া, সমাজপতি তারিণীশঙ্করের প্রতি কটাক্ষবান নিক্ষেপ করিতে করিতে মন্থরগমনে গৃহের মুখে হাঁটিলেন। এই ব্যাপারে স্বয়ং তারিণীশঙ্কর কি পাইলেন তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিব না, তবে আপনারা এইমাত্র জানিয়া রাখিবেন—রাজীববাবুর একমাত্র ভূসম্পত্তি (যাহা গ্রামের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল) বেনামীতে তারিণীশঙ্করেরই সম্পত্তিভুক্ত হইল; এবং বিধবার শেষ সম্বল অলঙ্কারগুলির দাম হইতে সমাজপতির প্রাপ্য টাকায় তারিণীশঙ্কর নাকি দ্বিতল গৃহের পত্তন ফেলিলেন!

এ ব্যাপারে সকলেই সন্তুষ্ট; হেমপ্রভা সরল বিশ্বাসে স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ধন্যা হইলেন, আর সমাজপতি একটী আসন্ন কন্যাদায়গ্রস্থ বিধবাকে পথে বসাইয়া কর্ম্মকাণ্ডের জয়ের সঙ্গে মনুসংহিতার বুলি আওড়াইয়া হিন্দুসমাজের গৌরব রক্ষা করিলেন!

সম্বলহীনা বিধবার কন্যাদায়! সমাজ তাহার করিবে কি?

শ্রীউচিতানন্দ।

ভ্রান্ত

এ জীবন রবে কতদিন, হে ভ্রান্ত মানব!
আয়ুতো বাড়েনা, ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুচ্ছ এ বৈভব;
বুঝেও তা বুঝিলে না, মত্ত আছ মোহ-মদিরায়,
অমূল্য রতন তুমি ফেলে দিলে দূরে; স্বর্গ সুখ
হারালে হেলায়!

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

অরণ

চৈত্র—১৩৩৩

অরুণা

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

প্রথম বর্ষ] চৈত্র—১৩৩৩ [সপ্তম সংখ্যা

নবদ্বীপ দর্শন *

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীনবদ্বীপধাম, পূতসলিলা জাহ্নবীর কূলে অবস্থিত এবং স্বভাবতঃই শোভাময়; সাক্ষাৎ দ্রব-ময়ী ব্রহ্মরূপিনী গঙ্গাদেবীর তালে তালে নর্ত্তনভঙ্গি যেন বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবানের তথায় আবির্ভাব ও নর্ত্তন কীর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। বহুকাল পূর্ব্বে নহে, চারিশতবর্ষ-মাত্র পূর্ব্বে, শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালী বেশে আবির্ভূত হইয়া এই নবদ্বীপেই প্রেমের বন্যা উদ্ভূত করিয়া তাহার উত্তাল তরঙ্গে সমুদয় বঙ্গ-দেশকে প্লাবিত করিয়াছেন; শুধু বঙ্গ নহে সুদূর উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশকেও সেই প্রেম-বন্যার উচ্ছ্বাসে, উচ্ছ্সিত করিয়াছেন; ইহা বাঙ্গালার সৌভাগ্য এবং বাঙ্গালীরও সৌভাগ্য।

মাঘী পূর্ণিমার কয়দিন পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ-ধাম লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে; এবারও উঠিয়াছিল। লক্ষাধিক নরনারী চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছেন; চারি-দিকেই হাসি আর আনন্দ; বড়ই মধুর দৃশ্য!

---

* ১৩৩২ সালে লিখিত।

দলে দলে লোক ভক্তিপূতচিত্তে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। কাপড়, বাসনাদির বিস্তর দোকান বসিয়া গিয়াছে; যাত্রিগণ বিশেষতঃ নারীগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ভুলিতেছেন না। গঙ্গাতীরে, শুধু স্নানের সময়ে নহে, সততই অসংখ্য লোকসমাগম। গঙ্গার বালুকাময় তটে সাধু-সন্ন্যাসীর অবস্থান, দেখিবার বিষয়। পশ্চিম দেশীয় বহু সাধুর আগমন হইয়াছিল; অনেককেই দেখিলে ভক্তিতে চিত্ত স্বতঃই তাঁহাদের চরণে অবনত হইয়া পরে। তাই মনে হয়, তীর্থস্থানে যেমন ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করিবার সুযোগ থাকে, তদ্রূপ সাধু মহান্তের পদধূলিগ্রহণেরও সুবিধা পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে নবদ্বীপে আর একটি বস্তু অতীব লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক, সেটী আর কিছু নহে, বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণের পদকীর্ত্তন। মন্দিরে মন্দিরে সর্ব্বত্রই গান কীর্ত্তন হইতেছে; সকল-স্থানেই লোকের ভিড়। বিশেষতঃ যে সমুদয় মন্দিরে বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণের কীর্ত্তন হইতেছে তথায় বসিবার স্থান পাওয়া দুষ্কর। কোথাও ব্রজলীলা, কোথাও গৌরাঙ্গলীলা গীত হইতেছে।

ব্রজধামের শ্রীরাধাগোবিন্দই ত আমাদের নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ; শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া জগৎকে চৈতন্য দিলেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। যিনি ভাবিবেন সামান্য নায়ক নায়িকার ন্যায় শ্রীগোবিন্দ এক বস্তু এবং শ্রীরাধিকা পৃথক বস্তু, তাঁহার বড়ই ভ্রম হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীগোবিন্দ সচ্চিদানন্দ, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি রহিয়াছে; এই হ্লাদিনী-শক্তি বা আনন্দাংশই শ্রীরাধিকারূপে প্রকটিত, বস্তুতঃ শ্রীগোবিন্দই শ্রীরাধিকা, এক-তত্ত্ব হইয়াও 'দেহভেদংগতৌ তৌ' তাঁহারা দেহভেদ প্রাপ্ত মাত্র। শ্রীরাধাগোবিন্দই এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সমুদিত।

বাস্তবিক পক্ষে ভাবুক ভক্তের পক্ষে এই সময়ে নবদ্বীপধাম শ্রীভগবানের আনন্দময় মূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। এক ভূমিকা হইতে দেখিতে গেলে শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানঘন-মূর্ত্তি; আবার ভূমিকান্তর হইতে দেখিতে গেলে তিনি আনন্দঘন-মূর্ত্তি। তিনি অনন্ত আনন্দ, অনন্ত-প্রেম স্বরূপ। এই অনন্তপ্রেম সাগরই তত্ত্বতঃ শ্রীরাধিকার প্রকৃত রূপ। আনন্দাংশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীগোবিন্দ এই প্রেমসিন্ধু-রূপিণী রাধিকারূপে নিজকে সম্যক্ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চিদাংশাদি অপরবিধ অংশ রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই প্রোক্ত হইয়াছে। আর এই যে প্রেমের সাগর রহিয়াছে, ইহার লহরী আছে, বুদ্‌বুদ্ ও আছে। আমরা যে সামান্য নগণ্য জীব, আমরাও এই প্রেমসাগরের অঙ্গীভূত বা অংশভূত। শ্রীরাধার সখীগণের সঙ্গিনীরূপা যে আমরা, আমাদেরও এই প্রেম-সাগরের প্রেমের খেলায় যোগদানের বিষয় আছে।

নবদ্বীপে এই কীর্ত্তনানন্দে, ভক্ত এই প্রেমের উচ্ছ্বাস সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার ভগবদ্ দর্শন করাই ঘটিতেছে। তিনি আনন্দবিহ্বল অবস্থায় নয়ন নিমীলিত করিয়া

রহিয়াছেন ; আর শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের মূর্ত্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত পদকর্ত্তাগণ কর্তৃক রচিত পদসমূহ যোগ্যজন কর্তৃক গীত হইয়া, এই অভাবনীয় বিস্ময়াবহ ব্যাপার সংঘটিত করিতেছে ; যেন কতশত বিচিত্র ভাবে চিত্রিত চিত্রপট সমূহ ভক্তচক্ষুঃ সমীপে নীত ও প্রদর্শিত হইতেছে।

ভক্ত ভাবে বিভোর ; তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা নাই। সম্মুখেই দেখিতেছেন, আহা কি সুন্দর অপরূপ রূপ,—

'নব নীরদ তনু, তড়িতলতা জনু,
পীত পাতনি-বলি ভাল।
মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল,
মৌলি মিলিত বনমাল।'

ঐত তিনি সম্মুখে আসিতেছেন, আহা তাঁর গমনের কি ভঙ্গি,—

'অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জীর,
আধপদ চলনি রসাল।'

কৃষ্ণের এ কি ভাব; রাধিকার প্রথম দর্শনে তিনি ভাবাবেশে বিভোর, 'রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর।' তাই তিনি বলিতেছেন,—

'অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী হীন হিমধামা।'

এদিকে শ্রীরাধিকারও সেই দশা। তিনি অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিতেছেন,—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।'

ভক্ত মানস চক্ষে কখনও বাসক সজ্জা হেরিতেছেন। রাধিকার আদেশে বাসকসজ্জা রচিত হইতেছে,—

'ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আলিস কারণ,
প্রতিফুলে ফুলশর'।

রাধিকা সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু কই তিনি ত আসিলেন না। শ্রীরাধিকা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, সখীকে বলিতেছেন,—

'ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে'।

শ্রীরাধিকা আজি অভিমানিনী। শ্রীকৃষ্ণ কত চাটুবাক্য কহিতেছেন, বলিতেছেন, প্রিয়ে ক্ষমা কর, আর অভিমান করো না। দুটী কথা কও।

'বদসী যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্'।

কিন্তু রাধিকার আজি নিদারুণ মান,—

'মানিনী মানে, অবনী-পর লেখই
নয়ানে না হেরই শ্যামা'।

নাগর কত সাধিলেন, কত কাঁদিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

এবার শ্রীরাধার মান কোথায় ভাসিয়া গেল; তিনি কত করুণা করিয়া কাঁদিতেছেন —

'আঁধল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু,
সো বহুবল্লভ কান,
আদর সাধে, বাদ করি তা সহ,
অহর্নিশ জলত পরাণ।'

শ্রীমতী আরও বলিতেছেন —

'যা কর চরণ, নখর রুচি হেরইতে
মূরছয়ে কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল,
পালটি না হেরিনু হাম।
সজনী কি পুছলি হামারি অভাগী।
ব্রজকুল নন্দন, চাঁদ পেখনু,
দারুণ মানক লাগি।'

চক্ষুর সম্মুখে শ্রীমতীর দুঃখ হেরিয়া ভক্তের নয়নে কতই অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে।

আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন হেরিয়া ভক্তের প্রাণ আনন্দোচ্ছ্বাসে পুলকিত হইতেছে।

'কি কহব রে সখী আনন্দ ওর,
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।'

শ্রীরাধিকার তানের সহিত তান মিলাইয়া ভক্তও যেন বলিতেছেন :—

'আজ্ রজনী হাম ভাগ্যে পোহাইনু
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরা নন্দা।'

কখন ভক্ত নয়নসমীপে হেরিতেছেন, আর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, 'নাথবান কনক, কষিত কলেবর, মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।' তাঁহার বদন, শরতের ইন্দুর ন্যায় মনোহর; তিনি সদাই ভাবে অবশ, অঙ্গে কদম্ব কুসুমোপম পুলকের পংক্তি। কখন কাঁদিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন গদগদ স্বরে কহিতেছেন। আহা! ইনিইত প্রেম সিন্ধু!

'ভাবে অবশ দিবস রাতি, নীপ কুসুম পুলক পাঁতি
বদন শরদ ইন্দুয়া,
খনে রোদন খনে হাস, আনহি চরণ বিরস ভায,
নিবিড় প্রেম সিন্ধুয়া।'

ভক্ত নয়ন নিমীলিত করিয়া এই মূর্ত্তি হেরিতেছেন। আবার নয়ন উন্মিলন করিয়া হেরিলেন সেই প্রেম সিন্ধু গৌরাঙ্গ সুন্দরের মূর্ত্তি। শুধু তিনি একা নন, দক্ষিণ পার্শ্বে, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীবলরাম, সেই নিত্যানন্দ দাতা, শ্রীনিত্যানন্দ রহিয়াছেন, ভক্ত ভাবিতেছেন 'আমি কোথায়? এত চিন্ময় গোলকধাম, সেই প্রেমের সাগরে আমিও ত মজ্জমান রহিয়াছি। এখানে দৈন্য নাই, দুঃখ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, মিথ্যা নাই, মলিনতা নাই। আজি ধন্য আমি, ধন্য আমার নয়ন, ধন্য আমার শ্রবন, আর ধন্য আমার নবদ্বীপ দর্শন।

শ্রীনৃত্য গোপাল রুদ্র।

আমার বীণা

কলকাতার এ কলরবের বদ্ধ বাতাস ছেড়ে,
　　শান্তি যেথায় লুকিয়ে শুয়ে ছিল,
সেইখানে সেই গাঁয়ের পথে, কানন ঘেরা মাঠে
　　আজ কে মোরে হঠাৎ পাঠাইল!

পথের ধারে, দীঘির পারে, কাজল-কালজলে,
　　স্নিগ্ধ শীতল বাতাস করে খেলা;
পাড়ের পরে নারিকেলের গাছের সারি সারি
　　দাঁড়িয়ে থাকা নীরব ঘন মেলা।

সাঁঝের আঁধার প্রহেলিকার কাপড়খানি পরি'
　　ছুটে বেড়ায় পাশের মৌন বনে;
নীরব ষড়যন্ত্রে যেন গাছের চাওয়া চাওয়ি,
　　গভীর ধ্যানে মগ্ন জনে জনে।

সেইখানে সেই পুকুর পারে পাদক ঘেরা পথে
　　ভাবছি কোথায় এলাম নাহি জানি,
এমন সময় বাঁধাঘাটের সোপানশিলা পরে
　　কুড়িয়ে পেনু আমার বীণাখানি।

যেখানে ঐ পল্লীপথে গোল গিয়াছে থেমে,
　　আসছে নেমে সাঁঝের নীরবতা;
পথের ধারে কুটীরগুলি ছবির মত আঁকা
　　জড়িয়ে গায়ে সবুজ সজীবতা।

কুকুর নিজের স্বভাব ভুলে ছেড়েছে ডাক দেওয়া,
　　পথিক কথা কইছে ধীরে ধীরে;
যেনরে কোন্ রাজায় দেখে সম্ভ্রমে সব নত,
　　চঞ্চলতা আজ গিয়াছে ফিরে।

যেখানে ওই বনের পথে ফিরে দখিন বায়ু
　　আকুল করি তরুণ তরুণীরে;
হৃদয় ভরা গন্ধ লয়ে মুকুল উঠে ফুটি,
　　আমের বনে যে বাস ঝরে ধীরে।

শান্তিভরা নীরব দিশি নীরব করি আরও
　　কোকিল শুধু ডাকছে আপন মনে,
বিজন সারা প্রান্তটী জুড়ে আবেগভরা স্বরে
　　উঠছে বেজে কিসের বাঁশী বনে।

যেখানে ওই গ্রামের শেষে পথ গিয়াছে চলে
　　জানি না কোন্ সবুজ পরীর দেশে।
দিক্-বধূরা আব্ছায়াতে করছে চলাফেরা
　　গোপন সাজে কুহকিনীর বেশে।

কলের শব্দ আসছে ভেসে, জলের ধারা যেন
　　পাহাড় হতে পড়ছে অবিরত।
দূরে গ্রামের মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজে,
　　বনের ফাঁকে প্রদীপ জলে কত।

যেখানে ওই মাধুরীমায় স্বর্গ এল নেমে,
　　বিশ্বনাথের দুয়ার গেল খুলি;
সেইখানেতে সকল ভুলে চাইতে একে একে
　　কুড়িয়ে পেনু বীণার তন্ত্রীগুলি।

ভাবছি বসে আমার মাঝে শিল্পি এমন আছে
　　এ তার বীণে পরিয়ে দিতে পারে;
আমার হাতে এ মোর বীণা উঠবে নাকি বেজে,
　　ফুটবে নাকি কোনই সুর এ তারে?

এমন সময় ভিতর হতে বল্লে কে দেখ চেয়ে,
বীণায় কে তোর তার দিয়েছে জুড়ে ;
উঠিয়ে নিতে আপন মনে পরশ লেগে তারে
উঠল বেজে জানি না কোন্ সুরে।

জানি না কার লাগবে ভাল আপন মনে তবু—
বাজিয়ে যাব যশের ভিখারী না,
এযে আমার প্রভুর দেওয়া স্নেহের উপহার,
এযে আমার বড় সাধের বীণা।

৺সৌরীশচন্দ্র মৌলিক।

কুলীনের মেয়ে

(গল্প)

১

কৃষ্ণপুরের কুলীন ব্রাহ্মণ হেম লাহিরীর যখন প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, তখন মৃণালের বয়স বার বৎসর। মৃণাল বড় সুন্দর— যেন একখানি লক্ষ্মী-প্রতিমা! লাহিরীমহাশয় দুইটী মেয়ে 'কুলিনে' দিতেই সর্ব্বশান্ত হইয়াছেন, এখন এ সোনার-প্রতিমা কেমন করিয়া—কাহার হাতে তুলিয়া দিবেন তাহা আকাশ পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল—বার-বৎসরের কিশোরী মৃণাল যৌবনের সীমায় পা দিল—রূপের জোয়ার আনিয়া ভাদ্রমাসের ভরা-নদীর মত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

কেবল রূপেত মেয়ে বিকাইবে না—টাকা চাই, কাজেই মৃণালের বিবাহ হইল না।

গৃহিণী মহামায়া বলিলেন,—"দেখ, তুমিত চুপ-চাপ বসে আছ কিন্তু মেয়ের পানে যে আর চাওয়া যায় না। যেমন করেই হোক আসচে ফাল্গুন যেন না পেরোয়।"

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে "হুঁ" বলিয়া চুপ করিলেন।

তারপর বহু খোঁজাখুজির পর, একদিন তিনি মৃণালকে হরিশ্চন্দ্রপুরের পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক, বৃদ্ধ দীনুরায়ের চারিটী উপযুক্ত পুত্রকন্যার মাতৃস্থানে বসাইবার স্থির করিয়া আসিলেন।

মহামায়া শুনিয়া নীরবে অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

আজ মৃণালের বিবাহ। বর আসিয়া টোপর মাথায় দিয়া ছাঁদলা তলায় দাঁড়াইয়াছে। তখনও মহামায়া বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমা সাজাইতে-ছিলেন; মৃণালের সই তৃপ্তি আসিয়া মৃণালকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"সইমা, একি করছ, সইকে আমার স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিচ্ছ ?"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন,—"ক্ষ্যাপা মেয়ে,

কুলীনের ঘরে অমনিই হয়। ওর অদৃষ্টে সুখ থাক্‌লে ওতেই ও সুখী হবে। মিনু যে আমাদের কুলীনের মেয়ে!” “কুলীনের মেয়ে! তৃপ্তি চমকিয়া উঠিল! ধন্য মা তুমি, কোন্ প্রাণে তুমি এ স্বর্ণপ্রতিমা নিজ হাতে সাজিয়ে, বোধন না হতেই বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছ? তোমার প্রাণ কি একটুও কেঁপে উঠছে না? ধন্য তোমার পাষাণ হৃদয় মা!”

তবুও বিবাহ হইয়া গেল। মৃণাল সকলকে কাঁদাইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

তারপর এক বাদলাদিনে মৃণাল যখন তিনটী পুত্রকন্যার হাত ধরিয়া জন্মের মত সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা ঘুচাইয়া দীনবেশে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—মহামায়া কন্যাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন!

ওকি মা কাঁদ্‌ছো? কাঁদো, যত পার কাঁদো—প্রাণভোরে কাঁদো! যতদিন মৃণাল তোমার বুকে থাকবে, ততদিন চোখের জলে ভাসতে হবে। তখন তুমিইত মা গর্ব্বের সহিত বলেছিলে—“মিনু আমাদের কুলীনের মেয়ে!”

২

মৃণালের একুশ বৎসর বয়সে এজন্মের সাধ আহ্লাদ চিরদিনের মত ফুরাইয়া গেল! তাহার সুন্দর মুখখানি বিষাদের কালিমায় ছাইয়া ফেলিল—বৈধব্যের কঠোর ব্রত তাহাকে নিষ্ঠুরের মত পিষিতে লাগিল!

দিনান্তে কঠোর পরিশ্রমের পর মৃণাল যখন ছেলে মেয়েগুলিকে বুকে চাপিয়া ধরিত, তখন তাহার তপ্ত বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ শীতল হইত—বিষাদমাখা মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত!

অভাগিনীর এ সুখটুকুও বুঝি ভগবান সহিতে পারিলেন না। যখন পর পর একটি ছেলে একটি মেয়েকে, তিনি অভাগিনীর পূর্ণ কোল শূণ্য করিয়া টানিয়া লইলেন, তখন মৃণালের চোখের জল একেবারে শুখাইয়া গেল! সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল! তাহার বুকের মাঝে প্রবল কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল কিন্তু তবুও সে স্থির নিশ্চল—যেন পাষাণ-প্রতিমা! যখন তাহার শেষ অবলম্বন হিমানীকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিল তখন তাহার সঞ্চিত শোকবারি রুদ্ধ কপাট ঠেলিয়া ঝর ঝর করিয়া দুই চোখ বাহিয়া বুক ভাসিয়া গেল!

সুখের দিনও যায়, দুখের দিনও যায়। কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। মৃণালের দুখের দিনগুলিও এক এক করিয়া যাইতে লাগিল, মেয়েও বড় হইতে লাগিল—হিমানীর বিবাহের ভাবনা মৃণালকে চাপিয়া ধরিল!

ওপাড়ার মেজ গিন্নি মৃণালকে বলিলেন—“হাঁরে মিনু, হিমুকে কুলীনে দিবিতো? আর দেখ্ বাছা, যাটের কোলে ও তেরয় পা দিয়েছে, বিয়ে না দেওয়া আর ভাল দেখায় না। আর দেখিস বাছা ঐ সলিল ছোঁড়ার কথায় যেন কুলটা খোচাসনে। ও ছোঁড়াটা যেন ছিষ্টি ছাড়া—আরে তুই হলি ছুরিত্তিরের ছেলে, তুই কুলীনের মর্ম্ম বুঝবি কি?” মৃণাল কোন উত্তর দিল না।

সেত সবই বোঝে, কিন্তু আবার কুলীন! মৃণাল তার পোড়া অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে মা হয়ে মেয়ের সর্ব্বনাশ করিবে? না, তা সে কিছুতেই পারিবে না।

হিমানীর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল—কিন্তু সে দরিদ্র, বিধবার মেয়ে, কিছুই পাইবার আশা নাই; স্বার্থান্ধ অর্থলোলুপ বরের পিতারা,--হিমানী সুন্দরী হইলেও নাকটী একটু চাপা, কানদুখানা যেন খড়ার মত—রঙটা সুন্দর হইলেও ফ্যাকাসে—ভ্রুদুটী পাতলা আর ছোট চোখ দুটী একটু ট্যারা, খড়ম পা, উঁচু কপাল, চুলগুলি নেহাত খাটো, সুন্দরী হিমানীর নিখুঁৎ অঙ্গসৌষ্টবের মধ্যে ইত্যাকারে অশেষ খুঁৎ আবিষ্কার করিয়া নাক সিটকাইয়া চলিয়া গেলেন। মৃণালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, হিমানীর বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

৩

"শুনেছিস্ সলিল, মুন্সীগঞ্জের নবীন সাণ্ডেলের ছেলের সঙ্গে হিমানীর বিয়ের ঠিক হচ্ছে? আর এ বিয়ের ঘটক হিমানীর দিদিমা নিজে।" এই বলিয়া বিকাশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সলিলের প্রতি চাহিল।

"তাই নাকি, সেই মাতাল ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে?" কি জানি কি আশঙ্কায় সলিলের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল—চোখদিয়া দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

আজ দীর্ঘ আট বৎসরের কথা। প্রথম যে-দিন সলিল হিমানীকে দেখে তখন সে ছয় বৎসরের চঞ্চল বালিকা। এই পিতৃহীনা অভাগিনী মেয়েটীকে সে কতটাই না ভালবাসে। যখন একবার হিমানীর কি একটা সঙ্কট রোগ হয় তখন সেইত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অক্লান্ত সেবায় অভাগিনীর মেয়েটীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। কেহ একবার মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করে নাই, উপরন্তু এই বাপ খেকো কুলক্ষণা মেয়েটার সেবা করতে বাধাই দিয়েছিল। সেই হিমানী—তাহার বড় স্নেহের—বড় আদরের হিমানীকে আজ—তাহাকে একটু না জানিয়ে, "কুল" রাখতে একটা মাতালের হাতে তুলেদিতে উদ্যত!

দুঃখে অভিমানে সলিলের হৃদয় ভরিয়া উঠিল—চোখ দুটী জলে পুরিয়া আসিল।

সলিল বরাবর হিমানীদের বাড়ী আসিয়া ডাক দিল,—খুড়িমা!

মহামায়া ঘরের মধ্যে কি করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"কে সলিল—আয় বস্ বাবা। ওরে হিমু তোর মামাবাবুকে একখানা আসন পেতে দে।"

হিমানী আসন আনিয়া পাতিয়া দিল। সলিল আসনে না বসিয়াই বলিল,—"খুড়িমা, মুন্সিগঞ্জের নবীন সাণ্ডেলের ছেলের সঙ্গে নাকি হিমানীর বিয়ে দিচ্ছেন?"

মহামায়া এইবার সলিলের হঠাৎ আগমনের কারণটা বুঝিলেন। তিনি স্নেহমিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—"কি করি বাবা বল—আরত কোথাও

হলনা, আর এদিকে মেয়েও সেয়ানা হয়ে উঠল—কাজে কাজেই ঐখানেই ঠিক করতে হল। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে বল!"

সলিল শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"না খুড়িমা, এবিয়ে হতে পারে না। ইচ্ছা করে দৈবের দোহাই দিয়ে হিমানীর সর্ব্বনাশ হতে আমি কিছুতেই দেব না! জানেন খুড়িমা ছেলেটা একে মাতাল, তার উপর ঐ সাংঘাতিক দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মারোগ ওদের বংশগত! ওদের বংশে সকলেই ঐ রোগে মরেছে—আবার নবীন সাণ্ডেলকেও ঐ রোগে ধরেছে। আজ আপনি জেনেশুনে হিমানীকে বলি দিতে প্রস্তুত হয়েছেন?"

একটা অব্যক্ত বেদনায় সলিলের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল। অদূরে উপবিষ্টা মৃণালের চোখদিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

মহামায়া জানেন, সলিল হিমানীকে কতটা ভালবাসে। তিনি বুঝিলেন, সলিল আজ কতটা আঘাত পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তিনি সলিলের ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে পুরিয়া বলিলেন,—"দেখ বাবা সব বুঝি, কিন্তু টাকা চাই, টাকা কোথায় পাব বল? ওদের ওখানে হলে অল্পের মধ্যেই হবে, তা ছাড়া কুলটাও বজায় থাকবে।"

সলিল তাহার স্থির দৃষ্টি মৃণালের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—মিনুদি তোমারও কি সেই মত?

দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মৃণাল বলিল,—কি করি বল ভাই—হতভাগীর কোথাওত বর জুটল না। এখন যে কেও ওর ভার নিলে নিশ্চিন্ত হই! ও যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে—তেমনিই ওকে ভোগ করতে হবে! আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করা গেল কিন্তু কেও হতভাগীর পানে ফিরে চাইল না—সকলেই নাক সিটকে চলে গেল!"

গভীর বেদনায় মৃণালের মুখখানা বিকৃত হইয়া আসিল। সলিল আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—"তা হিমুই যদি তোমাদের এত ভার বোঝা হইয়া থাকে মিনুদি,—তবে ওর ভারটা না হয় আমিই ঘাড়ে তুলে নেব!"

মৃণাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, সলিলের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়-বিজরিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'হিমানীর ভার তুমি নেবে ভাই?'

সলিল অন্য ভাবেই কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই কথার মধ্যে যে গভীর অর্থ নিহিত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; লজ্জারক্তমুখে উত্তর করিল,—"হিমানীর বিয়ের ভার আমিই নেব!"

৪

কৃষ্ণপুরের শশীশেখর ভট্টাচার্য্য একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। সলিল তাঁহার একমাত্র পুত্র। পরদুঃখ কাতর শশীশেখর পুত্রকে নিজের মনের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরের দুঃখে সলিলের কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

হেম লাহিরীকে শশীশেখর গ্রাম সম্পর্কে দাদা

বলিতেন—সেই আত্মীয়তাসূত্রে সলিল মহামায়াকে খুড়িমা বলিত। মহামায়াও সলিলকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

পিতৃহীনা হিমানীকে সলিল আন্তরিক ভাল বাসিত। হিমানীরও যত আবদার উপদ্রব ছিল সলিলের উপর—সে তাহাকে নিতান্ত আপনার জনটীই ভাবিয়া লইয়াছিল।

সলিল যখন সহপাঠি বিকাশের মুখে শুনিল যে মহামায়া "কুল" রাখিবার জন্য একটা মাতালের হাতে হিমানীকে দিতে প্রস্তুত—তখন একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় টন টন করিয়া উঠিল!

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। রূপালী ঝর্ণায় স্নান করিয়া, সারা গ্রামখানি যেন হাসিতেছে। মাতাল বাতাস ফুলের বনে ঝুরু ঝুরু ফুল ঝরাইয়া পাতা কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদিক শান্ত নীরব। সলিল বাহিরের ঘরে একখানি মাদুরের উপর বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই খেলা দেখিতেছিল। সে আজ সমস্ত দিনই হিমানীর কথা ভাবিয়াছে কিন্তু কি করিবে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তাহার মন বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে! এমন সময় বিকাশ আসিয়া ডাকিল—সলিল!

সলিলের চমক ভাঙ্গিল। সে ম্লান দৃষ্টিতে বিকাশের প্রতি চাহিল।

সেই জ্যোৎস্নার রূপালী আলোকে বিকাশ দেখিল—সলিলের সুন্দর মুখখানি যেন বিষাদমাখা —তাহার প্রশস্ত ললাটে গাঢ় চিন্তার ছাপ।

বিকাশ পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "শুনলাম তুই নাকি হিমানীকে বিয়ে করবি বলে প্রতিজ্ঞা করেছিস?

সলিল শান্তভাবেই উত্তর দিল,—"যদি করেই থকি, তাতে কিছু অন্যায় হয়েছে কি?"

বিকাশ বিদ্রুপচ্ছলে বলিল—"না অন্যায় কিছু নয়—তবে তোর পছন্দটা আচ্ছা বটে! বুঝতাম হাজার দু'হাজার টাকা দেবে, তাহলেও বা হত। তোকে দেখছি একবারে যাদু করে ফেলেছে!"

সলিল বলিল,—"বেশ, স্বীকার করলাম তারা টাকাদিয়ে ছেলে কিনতে পারবে না, কিন্তু অপছন্দটা কিসে?"

বিকাশ উত্তর করিল—"অপছন্দটা কিসে! মেয়ে যদি সুন্দরী হত তা হলে এত লোক দেখতে এলো—তারা নাক সিটকে চলে যেত না।"

সলিল বলিল—"দেখ বিকাশ তুই ওটা মস্ত ভুল বুঝেছিস যারা নাক সিটকে চলে গিয়েছে, তারা মেয়ে অপছন্দের জন্য যায়নি—তারা গিয়েছে এখানে টাকা পাবার আশা নাই বলে। হিমানী অর্থহীণ গরীবের মেয়ে বলে আজ যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, টাকা পেলে তারাই আবার আদর করে নিয়ে যাবে। অর্থাভাবে সুরূপাও কুরূপা হয়, আবার টাকার জোরে কুরূপাও সুরূপা হয়—টাকার জৌলুষে তার কাল রূপ ঢেকে যায়!"

বিকাশ বলিল—"আচ্ছা ওসব কথা এখন থাক। তোর মা বলছিলেন যে শান্তিপুরের মেয়েটা পরীর মত সুন্দরী, তার সঙ্গে গা ভরা গয়না আর নগদ—"

সলিল বিকাশের কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল—"বিকাশ, তুই না লেখাপড়া শিখেছিস? তোর মুখে আজ আমি একথা শোনবার আদৌ আশা করি নি। জানিস বিকাশ, এই বাংলাদেশে কত শত কচি ফুলের মত মেয়ে ফুটতে না ফুটতে বরের বাপের বিষাক্ত নিশ্বাসে অকালে ধরার বুকে ঝরে পড়ছে! শত শত মেয়ের বাপ মায়ের বুক-ফাটা দীর্ঘনিশ্বাসে বাংলার আকাশ বাতাস ভরে উঠছে! এজন্য দায়ী কে? কুলীনের মেয়ে কুলীনে দাও—না হইলে কুলাঙ্গার হইবে, কাপের মেয়ে কাপে দাও—না হইলে 'কাপত্ব' থাকিবে না—জাতি যাইবে; এই রকম গণ্ডীর উপর গণ্ডী দিয়ে সমাজটাকে ঘিরে রেখেছে, অথচ যাদের দুবেলা অন্ন জোটা কঠিন তারা কেমন করে রাশ রাশ টাকা ঢেলে 'কুল' রাখবে, সে কথা কেউ একবার ভাবে না। বাংলার রাজা বল্লাল সেন নবগুণে ভূষিত ব্যক্তিকে "কুলীন" উপাধি দিয়েছিলেন—আর এখন সেই কুলীন সন্তান বিবিধ নেশার আকর হয়ে কুলীনের পবিত্র কুল উজ্জ্বল করছেন! তাঁরা কুলীন, কাজেই সাতখুন মাপ! বরের বাজারে এইসব জীবেরই মূল্য বেশী!

জানিস বিকাশ—ইহাই বাংলার সমাজ—ইহারাই বাংলার সমাজপতি, ইহারাই আবার সমাজের বিসবৃক্ষের বীজ! কিন্তু অন্ধ বঙ্গসমাজ সে কথা একবার ভাবে কি? প্রত্যহ ব্রাহ্ম সমাজে হাজিরা দিয়ে, গ্র্যাণ্ড হোটেলে বিদ্যুতের আলো, বিদ্যুতের পাখার নীচে টেবিলে বসে ম্লেচ্ছের হাতে চপ্ কাট্‌লেট্, মুরগীর ঝোল খেলে জাত যায় না; মদের স্রোতে হাবুডুবু খেলে জাত যায় না, আর কুলীনের মেয়ে কুলীনে না দিলে, কাপের মেয়ে কাপে না দিলেই জাত যায়! এমনি সমাজের বিচার!

দেখ বিকাশ,—শ্যেনপক্ষী যেমন শীকারের আশায় আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর শীকার পেলেই ঝাঁপিয়ে প'রে তার ধারাল ছুরীর মত নখ দিয়ে মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয়; আমাদে সমাজের কুলীনদল ঠিক তেমনি শীকারের আশায় বসে আছেন। সুবিধা পেলেই মেয়ের বাপের বুকে ছুরী বসিয়ে তার উষ্ণ শোনিত আকণ্ঠ পান করে কৌলীন্যের ডঙ্কা বাজাচ্ছেন, কেন না তাঁরা কুলীন! আর মেয়ের বাপও বানরের গলায় মুক্তা মালার মত পঞ্চাশ বছরের বুড়োর হাতে বার বছরের কচি মেয়ে দিয়ে 'কুল' রাখলেন, প্রতিবাদ করলে বললেন,—সামান্য একটা মেয়ের জন্য 'কুল' নষ্ট করে কুলাঙ্গার হব! তারপর যখন বছর ঘুরতে না ঘুরতে সিঁথির সিন্দূর ঘুচিয়ে মেয়ে এসে দাঁড়াল—তখন সকলে বললেন—'অদৃষ্ট'! বলদেখি বিকাশ, এ অদৃষ্ট না অদৃষ্টের পরিহাস! এই সমাজ নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি, এইসমাজের লোক বলে পরিচয় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিনে! এই আমাদের শিক্ষার ফল, এই আমাদের সভ্যতার নিদর্শন!

আজ এই স্বদেশী যুগে আমরা, হিন্দু মুসলমান এক হও, জাতিভেদ তুলে দাও, পতিতকে বুকে তুলে নাও তবে স্বরাজ পাবে বলে চীৎকার করছি, কিন্তু এটা একবার ভাবিনে যে, যাদের

নিজের সমাজ গড়বার ক্ষমতা নাই, তারা জাতি-ভেদ ভুলে, পতিতকে বুকে তুলে নিয়ে কেমন করে স্বরাজ পাবে!

সমাজের বুকে বসে স্বার্থান্ধ বরের বাপ মেয়ের বাপের রক্ত শুষে, বক্তৃতা দিয়ে সমাজপতি বলে পরিচয় দিতে যাচ্ছে। এর কি প্রতিকার নাই? দেখবি বিকাশ—এর প্রতিকার না হলে সোনার বাংলার সোনার সমাজ পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবে। অমানিশার ঘোর আঁধারে বাংলার বুক ভরে উঠবে, বাঙ্গালীর বুকভরা ব্যথা ভিন্ন আর কিছুই থাকবে না।”

বিকাশ সলিলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—দেখ সলিল, অত উত্তেজিত হসনে। তুই আমি লাফিয়ে কি করব বল—মাথার উপর বাপ মা রয়েছেন, তাঁদের উপর দিয়ে চলাটা কি আমাদের ভাল?

সলিল বিকাশের হাতখানা সবলে ছুড়িয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিল। তার উজ্জল চোখ দুটী আরও উজ্জল হইয়া উঠিল—বলিল—বিকাশ, আজ আমি মেয়ের বাপকে ভিটে মাটী বিক্রি করিয়ে তার মেয়েটীকে নিয়ে আসব—আচ্ছা বিকাশ তুই বুকে হাতদিয়ে বল দেখি, ভগবান কি তা সইতে পারবেন? মেয়ের বাপের বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে প্রাণটা কি একটুও কেঁপে উঠবে না? মনে পরে ওপাড়ার সান্যালদের সরলার বিয়ে? পণের টাকা কম হওয়াতে বরের বাপের আস্ফালন, আর সরলার বাপের করুণ ক্রন্দন! এখনও যেন সেই কান্নার সুর আমার কানে এসে বজ্রের মত বাজছে। বড়লোকের ঘরের নাটক নভেল পড়া পরীর মত মেয়ে বিয়ে করে ঘর সাজাবার লোক ঢের আছে; কিন্তু বলদেখি যারা চব্বিশ ঘণ্টা হাসি মুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, গরীব দুঃখীদের সেবা করাই যারা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করে, প্রকৃতই যারা সংসারের লক্ষ্মীশ্রী, তাদের জন্য কয়জন ভাবে? দরিদ্রের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? এখন-কার ছেলের বাপ ছেলের বিয়ে দিয়ে “গৃহলক্ষ্মী” চান না, তাঁরা চান টাকা! তাঁরা মেয়ে দেখতে চান না, যে বেশী দর হাঁকবে সেই-খানেই ছেলে বিক্রী করবেন—এ যেন ম্যাকেঞ্জি লায়ালের সেল!

বিকাশ নির্ব্বাক। সে সলিলকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—সলিল ভাই তোর মত বন্ধু পেয়ে আজ আমার জীবন সার্থক! তোর মত যদি সকলে হতে পারত, তাহলে বাংলা সমাজের এ হাহাকার নিমিষের মধ্যে থেমে যেত।

৫

সলিল হিমানীর বিবাহের জন্য সারা বাংলা দেশটাই ঘুড়িয়া বেড়াইল কিন্তু কোথাও পাত্র স্থির করিতে পারিল না। তারপর বাংলার বাহিরে, সুদূর লাহোর হইতে একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইল। সে সেই দিনই লাহোর রওনা হইল এবং বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া

ফিরিয়া আসিয়া মহানন্দে হিমানীর বিবাহের উদ্‌যোগে লাগিয়া গেল। মৃণালের বুক হইতে পাষাণের ভার নামিয়া গেল।

আজ হিমানীর বিবাহ। সকলের অনিচ্ছা সত্বেও সলিল দরজায় রৌসনচৌকী বসাইয়াছে—সানাই মধুর স্বরে সুর ধরিয়াছে। সমস্ত বাড়ীখানি সলিল আজ মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে—হৃদয় তার আনন্দে পূর্ণ; আজ যে তার বড় স্নেহের—বড় আদরের হিমানীর বিয়ে।

বিবাহলগ্ন উপস্থিত। বর আসিয়া ছাঁদলা তলায় দাঁড়াইল। এমন সময় বরের বাপ বলিলেন, —পণের টাকা আগে মিটাইয়া দাও পরে কন্যা সম্প্রদান হইবে। সলিল দ্বিরুক্তি না করিয়া এক গোছা নোট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিল। তিনি এক এক করিয়া নোটগুলি গনিয়া লইয়া পকেট হইতে নিক্তি বাহির করিয়া বলিলেন, "গহনা দেখি" সলিল গহনার বাক্স আনিয়া দিল। সমস্ত গহনা ওজন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"পাঁচভরি কম! পাঁচভরি সোনা অভাবে দেড়শত টাকা না পাইলে ছেলের বিবাহ দিব না।"

সলিলের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, সে দৃঢ়স্বরে বলিল—"অমন চামারের ঘরে আমরাও মেয়ের বিয়ে দেব না।"

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বরের বাপ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যতীন, ওঠ্‌ত—এ ছোটলোকের বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। সুন্দর সিং গাড়ীতে আলো দাও!"

দেখিতে দেখিতে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃণালের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—বিবাহের বেশে হিমানী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সলিল সকলকে বিস্মিত করিয়া বরের আসনে বসিয়া, শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল,—"আমিই এ বিয়ের বর, পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পড়ুন!"

বিবাহ হইয়া গেল। সলিল হিমানীর হাত ধরিয়া, মহামায়াকে প্রণাম করিয়া মৃণালকে প্রণাম করিল। অভাগিনী মৃণালের চোখের জল বর কন্যার মাথায় মাতৃহৃদয়ের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ঝরিয়া পড়িল!

শ্রীইন্দুমোহন ভট্টাচার্য্য।

সফল প্রেম।

নির্ম্মল ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেবার পূজার ছুটিতে কলেজ বন্ধ হলে বন্ধুবান্ধব মিলে পরামর্শ হ'ল এবার মধুপুরে গিয়ে ছুটি কাটান হবে।

ভয়ানক দুর্য্যোগ সেদিন; ষ্টেশনে এসে দেখি শুধু নির্ম্মলই এসেছে। এত বড় আগ্রহটাকে নিষ্ফল করে বাড়ী ফিরতে মন সরল না, দুজনেই মধুপুর রওনা হলেম।

মধুপুরে যেখানে আমাদের বাসা নেওয়া হ'ল —তার পাশেই ছিলেন এক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি। কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার পর, এখানেই চিরস্থায়ীভাবে বাসাটি বেঁধেছেন।

প্রথম তার সঙ্গে দেখা হ'ল একটা ছোট পাহাড়ী ঝরণার ধারে, পরিচয়ে জানলেম নাম তার লতিকা, ডেপুটি বাবুর বড় মেয়ে সে—বয়স অনুমান তখন বছর পনেরো ষোল। বাসা থেকে বের হতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর বেশী আলাপ হল না, লতিকা তার ছোট ভাই বোন গুলোকে নিয়ে বাসার দিকে চলে গেল।

যাবার বেলায় লতিকার সেই "নমস্কার নির্ম্মল বাবু" শব্দটি নির্ম্মলের কাছে বোধ হয় খুব মধুর লেগেছিল। তাই লতিকা চলে যাবার পর সে সেই চিন্তাই করতে লাগল বোধ হয়; ইত্যবসরে আমি কাব্য শাস্ত্রের একটু রস সঞ্চয় করবার জন্য মন নিবিষ্ট করলুম। হঠাৎ জলের ভেতর পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব চোখে পড়তেই চমক ভাঙ্গল।

চেয়ে দেখি চারিদিকে জ্যোৎস্নার উৎস ছুটেছে। আমি বললেম "নির্ম্মল! যাবিনে—চ!" —নির্ম্মল কোন কথা না বলে, চিন্তামগ্ন অবস্থায় আমার সঙ্গ নিল। ডেপুটিবাবুর বাসার সামনে আসতেই একটা মিঠে সুরের রেশ, বাতাস আর হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে, ভেসে এসে প্রাণে কি এক মাদকতা এনে দিল;—লতিকা গাইছে—

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—"

আমি বাসায় এসেই একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেম। সঙ্গিতের চাপা সুর তখনও এসে কানের পাশে মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছিল। আবার একটা সুর! ঘুম ভেঙ্গে গেল—কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানতেও পারিনি।

নির্ম্মলের ঘরে ঢুকেই দেখি, তার বাঁশীটি নিয়ে আপন মনে সে বাজিয়ে চলেছে, কোন ধারে দৃষ্টি নাই। আর দূরে পুষ্পিত লতিকা বেষ্টিত উন্মুক্ত-বাতায়ন-পার্শ্বে তরুণী লতিকা,—অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নির্ম্মলের পানে।

আমি বললেম—"এই ইডিয়ট আপন মনে খুব ত বাজিয়ে চলেছিস, তোর সুরের ব্যথায় ব্যথিত কে তা জানিস?"

বাঁশীটি থামিয়ে নির্ম্মল বললে—কে? আমি সুর করে বললেম—চেয়ে দেখ সখা ঐ দূর বাতায়ন পানে।

নির্ম্মল ফিরে তাকাতেই তাদের চার চোখে মিলন হল। মুগ্ধা তরুণী তখনও চেয়ে আছে নিস্পন্দ ভাবে। "আচ্ছা তোর কোয়ালিফিকেশন-বাবা;" বলে হাসতেই নির্ম্মল আমার হাসির সঙ্গে যোগ দিল। লতিকার বোধ হয় তখন জ্ঞান ফিরে এল, লজ্জায় সে সেখান থেকে সরে গেল।

পরদিন বেড়াতে বের হয়ে লতিকার সঙ্গে দেখা হল গোড়খানার ধারে, সে আর একটি তরুণ বসে গল্প করছে।

আমি আর নির্ম্মল তাদের খানিক দুরে গিয়ে বসলেম।

তরুণটি নাকি তার বাবার বন্ধুর ছেলে; সে

সেই দিনই এসেছে সকাল বেলা,—তাদের সঙ্গে দেখা করতে। লতিকার গল্পের দিকে আদৌ মন ছিল না—সে শুধু চেয়ে ছিল নির্ম্মলের পানে।

লতিকাকে আনমনা দেখে তরুণটি আমাদের পানে বক্র দৃষ্টি হান্‌তে লাগল। তারপর লতিকার ভাবটি যখন বাস্তবিকই অসহ্য হয়ে উঠল, তখন সে উঠে এগিয়ে এল আমাদের কাছে, বোধ হয় তার অসহ্য কারণের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে।

অদূরে লতিকা চঞ্চল হয়ে উঠল, আমরা তার মনোভাব বুঝেছি,—হয়ত তরুণকে বলে দেব ভয়ে। প্রথম অবস্থায় এমনিই হয় বোধকরি।

নানা রকমের গল্পের ভেতর দিয়ে তথ্য আবিষ্কার না করতে পেরে তরুণটি উঠে চলে গেল। লতিকা তার আগেই উঠে চলে গিয়েছিল।

পরদিন আমার ঘরে বসে আমি একটু সাহিত্য চর্চ্চা করছি, এমন সময় লতিকার ছোট ভাইটি এসে আমার হাতে একখানা চিঠি দিল।

চিঠিখানা খুলে পড়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নির্ম্মলকে ডাক দিলুম। নির্ম্মল চিঠিখানা পড়েই লজ্জায় বলে উঠল, ছিঃ অমরদা! তোমার এ চিঠি পড়া ঠিক হয়নি।

আমি অবাক হয়ে অভিমানের সুরে বললেম—আমরা পর হয়ে গেলেম নাকি? দেখেছি তাতে এমন কি হয়েছে; পরে সুর পালটে নিয়ে বললেম, বাঁশীর সুর কাজে লেগেছেরে। এইবারে দণ্ডায়মান পত্র বাহকের দিকে চেয়ে বললেম—দেখ খোকা! আবার যখন কোন চিঠি আনবে তখন একে দিও—এরই নাম নির্ম্মল। আমরা চিঠি দেখলে উনি অসুখী হন।

—নির্ম্মল একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও, কি বল অমরদা!

নির্ম্মলের কথামত শেষে একদিন ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করে, নির্ম্মলের সঙ্গে লতিকার বিয়ের প্রস্তাব করে ফেললেম। ডেপুটি বাবু একটু শ্লেষ-ভরে হেসে জবাব দিলেন। তা আমি আগেই জানিছে বাপু, যে তোমরা শিগ্রই এ রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসবে। দেখ শুধু প্রেম করলেই হয় না, একটু অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা উচিৎ ছিল যে, তোমরা খৃষ্টান আর আমরা ব্রাহ্ম; লতিও আজ আমাকে জানিয়েছে একথা। কিন্তু এতে আমি কেস আনতেম তা জান? শুধু লতি আর তার মার জন্য পারিনি। কোন সাহসে তোমরা এখানে এলে আমি শুনি?

আর কোন প্রত্যাশায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব! লজ্জায়, ঘৃণায়, নিরাশায় বুকটা ভরে উঠল, সেখান থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় পর্দ্দার আড়াল থেকে ভেসে উঠল দুটি অশ্রুসিক্ত ব্যথা ভরা ডাগর চোখ। মাথা নিচু করে বেড়িয়ে এলাম।

নির্ম্মল হতাশ প্রাণে বাসার পানে চলে গেল। আমি বরাবর মাঠের প্রান্তে বাঁধটার ধারে এসে বসে ভাবতে লাগলেম, সেই তরুণ তরুণীর অন্তর-ফল্গুর ভেতর প্রেমের বন্যার কথা। লতিকাদের বাসার সেই তরুণটি আসবার পর হতে আর মুখোমুখী—নির্ম্মলের সঙ্গে লতিকার আলাপ হয়নি;

প্রাণের যত আকুল উচ্ছ্বাস তাদের কাগজ কলমের ভেতর দিয়েই চলত। সেই অন্তর আকুল করা চিঠির মর্ম্ম শুধু সেই প্রেমিক প্রেমিকাই বুঝত —তা যে অপ্রেমিকের বোঝবার সাধ্যের অনেক বাইরে।

অনেক রাতে বাসায় ফিরে নীচের তলায় ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে জানলেম নির্ম্মল অসুস্থ বলে—কিছু খাবে না—শুয়ে পড়েছে।

তবু তাকে দুএকটা ডাক দিয়ে যখন কোন সাড়া পেলাম না তখন তার পাশের ঘরে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুয়ে পড়লেম।

অনেক রাতে একটু তন্দ্রা এসেছিল হঠাৎ একটা কান্নার সুর একছন্দে এসে আমার কানে পৌছিল। চেঁচিয়ে উঠলেম—নির্ম্মল! নির্ম্মল! কোন সাড়া পেলেম না, হয়ত বা আমারই ভুল হয়েছে শুনতে। আবার ঘুমিয়ে পড়লেম। অনেক বেলা হয়ে গেল—নির্ম্মল উঠেনি। নির্ম্মল—নির্ম্মল, ডাকতেই পাশের বাসায় একটা কোলাহল শুনতে পেলেম। মুহূর্ত্ত মধ্যে ডেপুটি বাবু সদলবলে আমাদের বাসায় এসে হাজির। তাদের দেখে আমার হৃদয়টা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠ্‌ল।

ডেপুটিবাবু রোষ-কষায়িত নয়নে বলে উঠলেন—এই যে,—পালাতে পারনি, সে জুয়োচোর বোধ হয় পালিয়েছে—লতিকাকে নিয়ে! আমি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেম।

ন্যাকা! বড় ভাল মানুষ না—বন্ধু কোথায় তোমার? আমি সভয়ে ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকিয়ে বললেম—এই ঘরে।

তিনি শ্লেষভরে বললেন—ও, তাদের বুঝি এখনও রাত ভোর হয়নি?

কারও অপেক্ষা না করে সেই পূর্ব্বপরিচিত তরুণটী ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে আগল ভেঙ্গে ফেললে। আমরা সেই কক্ষে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলেম, এক বৃন্তে দুটি ফোটা ফুলের মত নির্ম্মল, লতিকা—পরস্পরে পবিত্র আলিঙ্গনে বদ্ধ। চোখে তাদের স্বর্গীয় দীপ্তি, তাতে ফুটে উঠেছে সত্যসত্যই একটা বিরাট সফলতার ভাব।

তাদের নীরব চোখের নীরব ভাষা যেন বলছে—প্রেম পার্থিব বিলাস মাখান নহে, সেখানে কামনা নাই,—সে চায় শুধু শান্তি। তাই আমরা চলেছি—পবিত্র প্রেম সঙ্গে নিয়ে সেই মিলনের দেশে—সেথায় সামাজিকতা নেই, দুঃখ ক্লেশ নেই, বাধ্যবাধকতা নেই—আছে শুধু পবিত্র মিলন আর স্নিগ্ধ শান্তি।

শ্রীসরোজ বন্ধু রায়।

অরুণা

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম ।"

প্রথম বর্ষ] বৈশাখ—১৩৩৪ [অষ্টম সংখ্যা

সফলতা

তোমার স্নেহের দান
আমি, রাখবো মাথায় ক'রে ।
তোমার সরলতার ছবি
আমার নীরবতা মাঝে
রাখবো আমি—
মনের অন্তঃপুরে !
আমার সকল ব্যথা, দুখের কথা,
গেছে ধুয়ে, স্নেহের সুধাধারে।

জীবন-পথের চলা আমার
যেদিন হবে শেষ,
পথের শেষে—
তোমায় আগে
পারি যেন জানিয়ে যেতে
তোমার দানের অসীমতা,—
যেথায় রাজে অমল সুখের দেশ ;
চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে,
—এই নিবেদন তোমার চরণ-মূলে !

সম্পাদিকা

পথ

এ জগতটা একটা অদ্ভুত রকমের গোলকধাঁধা, আর মানুষ এই গোলকধাঁধার ঘুর্ণিপাকে পড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই গোলকধাঁধা হতে মুক্তি পাবার জন্য সে অহোরাত্র চেষ্টা করে কিন্তু নিষ্ক্রামণের পথ আর খুঁজে পায় না। সে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি যেন একটা অব্যক্ত ধনের আশায়, একটা প্রাণমাতান, হৃদয়জুড়ান অফুরন্ত সুখের লোভে, পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়ায়। সেই অপাওয়া জিনিষটা পাবার আশায় সে সামনে যে সুন্দর সরল পথটী দেখতে পায়, সেইটাকেই নির্গমের নিশ্চিত পথ ভেবে এক রঙ্গীন মদিরায় মাতোয়ারা হয়ে প্রাণের আবেগে ধেয়ে যায়; কিন্তু কিছুদূর যাবার পর যখন দেখে যে সামনেই একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করা রয়েছে, তখন সে একবার থমকে দাঁড়ায় মাত্র, পরক্ষণেই আবার সে পথটা ছেড়ে দিয়ে নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে আর একটা সুন্দর পথ ধরে। এমনি করে সে জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই চিরআকাঙ্খিত ধনটা পাবার জন্য এই গোলকধাঁধার ঘুর্ণিপাকে, ঘুর্ণিচক্র খায়, তবু সে ঠিক পথ খুঁজে পায় না।

সে যে জিনিষটাকে সুন্দর দেখে, যেটা তার চিত্তাকর্ষণ করে, সে তারই দিকে ছোটে, তার সেই আকাঙ্খিত সুন্দরকে পাবার জন্য। সেই চিত্তাকর্ষক জিনিষটাকে পেলে সে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যটুকুতেই আপনহারা হয়ে যায় এবং এটাকে প্রাণভরে উপভোগ করে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু যখন তার চোখের নেশা ছুটে যায়, তার সেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যমত্ত অন্ধচোখে একটা অসীমের আলো ক্ষীণ আবছায়ার মত দেখতে পায়, তখন তার ভোগলালসা কমে যায়, সে তখন বুঝতে পারে তার সেই আকাঙ্খিত সুন্দরে আর এই লব্ধ সুন্দরে কতটা প্রভেদ—তাই তখন সে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আর একটা সুন্দরের পিছু ছোটে। পুনঃ সে যখন সেই সুন্দরের নিকট পৌঁছায় তখন আবার তার সেই ক্ষীণ আলোটুকু নিবে যায়—সে কেবল আবরণটুকুতেই হাবুডুবু খেতে থাকে, ভিতরের সার পদার্থটুকু আর খুঁজে পায় না। এমনি করে প্রতিদিন সকাল বেলায় শূন্য হৃদয়ে সে সুন্দরের পিছু ছুটে যায় কিন্তু বৈকালে সে ফিরে আসে তার শূন্য হৃদয়কে দ্বিগুণ শূণ্য করে।

কখনও সে তার সেই অপাওয়া সুন্দরকে পাবার আশায় নদীতটে গিয়ে নদীর সুমধুর "কুলুকুলু" ধ্বনিতে বিমোহিত হয় এবং নিজের বীণা সেই প্রাণমাতানো "কুলুকুলু" তানের সঙ্গে একসুরে বেঁধে তার সাথে গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে এক কল্পনা রাজ্যে চলে যায়, কখন বা নদীতরঙ্গে "ছলছল ঢলঢল" উদ্দাম নুপুর ঝঙ্কারের সঙ্গে তার নুপুর এক ছন্দে বেঁধে, সেই নৃত্যের তালে তালে নাচতে থাকে কিন্তু সে একটু ভেবে দেখে না যে এই সুধামাখা "কুলুকুলু" স্বরে কে মনপ্রাণ মাতাচ্ছে, কে তার নুপুর ঝঙ্কারে তার

প্রাণে এক নূতন ঝঙ্কার তুলে দিচ্ছে। সে কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যটুকুকেই তার আকাঙ্খিত সুন্দর ভেবে আনন্দে এতটা আত্মহারা হয়ে যায় যে তার আর ভিতরে ঢুকবার অবসর থাকে না—তাই সে আর আকাঙ্খিত সুন্দরকে দেখতে পায় না।

কখনও আবার মনোমুগ্ধকর ফুল দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার পানে ধেয়ে যায় এবং তাকে তার সেই আকাঙ্খিত সুন্দর ভেবে কখনও বা আবেগে বুকে চেপে ধরে, আবার কখনও তার পেলব পাপড়ি গুলোকে চুম্বনের পর চুম্বনে ফ্যাকাশে করিয়া ফেলে কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও ভেবে দেখে না যে সে কাহাকে বুকে ধরে আছে, কাহার রক্তিমাভ গণ্ডে সে সোহাগভরে চুম্বন করছে। সে শুধু phenomenon তেই এতটা মত্ত হয়ে পড়ে যে noumena র কথা একেবারে ভুলে যায়—তাই সেই তার সুন্দরের অপরূপ রূপ দেখতে পায় না, কেবলমাত্র সেই অপরূপের একটা ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র দেখতে পায়।

ধরার আলোক পাবামাত্র সে ধেয়ে যায় একটা অসীমের আলোক পাবার আশায় সাহসে বুক বেঁধে কিন্তু দিনের শেষে ফিরে আসে বিফলতার হতাশ্বাস নিয়ে। কিন্তু ধরার আলোক তার কাছে যখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে তখন সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং হতাশার একটা কাষ্ঠহাসি হেসে ভাবে যে সারা জীবনটাই সে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যমায়ার চক্রে ঘুরে বেড়িয়েছে, মণির খোঁজে বার হয়ে মণির আবরণেই মেতেছে, সে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যেই হাবুডুবু খেয়েছে আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য আর দেখতে পায়নি—যেখানে তার আসল সুন্দর বসে আছে। সে শুধু মনোমুগ্ধকর সুন্দর জিনিসের দিকেই ছুটে গিয়েছে তার অপাওয়া সুন্দরকে পাবার জন্য কিন্তু শত-শত কুৎসিত পথ যে তাকে কুপথে যেতে দেখে বন্ধুর মত আকুল হয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তা সে ভ্রুক্ষেপও করেনি, আপন মনেই চলেছে।

কিন্তু তার অন্ধচক্ষু যখন হতাশার মর্ম্মান্তিক বেদনায় সেই অসীমের আলোক দেখতে পায় তখন তার শরীর ও মন এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে আসল সুন্দরকে দেখেও তার সেখানে যাবার ক্ষমতা বা সামর্থ থাকে না; তাই সে নূতন উদ্যম সঞ্চয় করতে চলে যায় এক অচেনা দেশে।

তবে কি এই গোলকধাঁধা হতে মুক্তি পাবার, সেই চিরআকাঙ্খিত সুন্দরকে পাবার কোন উপায় নাই? নিশ্চয় আছে। যেখানে ঢুকবার পথ আছে সেখান হতে বাহির হবার পথও অবশ্য আছে। এই গোলকধাঁধা হতে মুক্তি পাবার পথ অসংখ্য এধার ওধার ছড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে কতগুলি সুন্দর, আপাতসুখকর আর কতগুলি কুৎসিত, আপাত দুঃখময়। সুন্দর পথগুলি ফুলে ঢাকা সাপের মত আর কুৎসিত পথগুলি সাপে ঢাকা ফুলের মত। সুন্দর পথগুলি, সুন্দর সুগন্ধি ফুলের খোলস পড়া কাঁটার বাগান আর কুৎসিত পথগুলি কাঁটাগাছের খোলস পড়া সুন্দর ফুলের বাগান। সুন্দর পথগুলি সুখের আড়ালে দুঃখের

মত আর কুৎসিত পথগুলি দুঃখের আড়ালে সুখের মত। এই উভয়প্রকার পথপ্রান্তেই সেই আকাঙ্খিত সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর হাত বাড়িয়ে মনুষকে কোলে তুলে নেবার জন্য। কিন্তু সুন্দর পথধরে, সেই সুন্দরের কাছে পৌছান ভয়ানক কষ্টকর। সুন্দর পথগুলি বারবিলাসিনীদিগের ন্যায় বাহিরটাকে বিবিধপ্রকার চিত্তাকর্ষক রূপের ডালা দিয়ে সাজিয়ে, অন্তরে বিষের কুম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মানুষকে সৌন্দর্য্যের লোভ দেখিয়ে বিষ-সগরে নিক্ষেপ করবার জন্য। মানুষ এই পথভোলান নয়নমনোমুগ্ধকর রূপের মোহে পড়ে যাদুমন্ত্রচালিতের ন্যায় সেই দিকে পাগলের মত ধেয়ে যায় কিন্তু কিছুদূর সেই পথ ধরে যাবার পর, যখন দেখে যে সামনেই মস্ত একটা কণ্টকপূর্ণ পথ পড়ে আছে, তখন সে চোখে সরিষা ফুল ..খে। তার সৌন্দর্য্যমত্ত সুখের শরীর এই অসুন্দর কণ্টকপূর্ণ পথ দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে, সেই পথ উত্তীর্ণ হবার শক্তি বা সাহস তখন আর তার থাকে না; তাই সে সেই সুন্দর, অসুন্দরের মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে নির্জ্জীবের মত বসে পড়ে, তার আর সুন্দরের দর্শন ঘটে না। আর কুৎসিত পথগুলির কোন বাহ্যিক চিত্তাকর্ষণী শক্তি নাই, তারা অন্তরের অমৃতকে কঠিন আবরণে ঢেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—বহুমূল্য মণিগুলো যেমন কঠিন ঝিনুকের আবরণে আপনাকে ঢেকে রাখে সেই ভাবে। যারা তাদের কঠিন আবরণ দেখে ভয়ে পিছিয়ে না প'ড়ে সাহসে বুক বেঁধে বীরের মত এগিয়ে যেতে পারে, তারাই অন্তর্নিহিত অমৃতের স্বাদ পায়, তারাই সেই অসীমের আলোক পায়। যারা জীবনের প্রভাত হতেই সুখের পথটা ধরে এই গোলকধাঁধা হতে মুক্তিপাবার জন্য, তারা যখন সুখের সীমানা পার হয়ে দুঃখের সীমানায় এসে পড়ে, তখন আর তারা দুঃখ সহ্য করতে পারে না; দুঃখের কঠিন পরশে তাদের সুখভোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে, তারা সেই মাঝখানেই পড়ে থাকে। আর যারা জীবনের প্রথম হতেই দুঃখের পথটা অনুসরণ করে, যারা দুঃখের নির্ম্মম প্রহারগুলি বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নিয়ে অবিচলিত হৃদয়ে পথ ধরে চলে যায়, তারা যখন সুখের সীমানায় এসে দাঁড়ায়, তখন সুখের কোমল পরশ তাদের মর্ম্মক্লান্তশরীরে কি এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে দেয়। তারা তখন সেই সুখময় পথ ধরে অনায়াসে সেই আকাঙ্খিত সুন্দরের কাছে পৌঁছিতে পারে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র বসু।

বাদলা দিনে

বাদলে মাদল বাজে, কাঁদন সুরে !
কোন সে দরদী বঁধু বেদন ঝুরে !
ব্যথাটী যে এ হিয়ার,
হানিছে হিয়ায় কার,
ছল ছল ঢল ঢল আঁখিটী নীরে।
বাদলে মাদল বাজে কাঁদন সুরে !

কিবা কোন অভিমানী অশ্রু হানে
পরদেশী বঁধুয়ার বিরহ ক্ষণে ;
সকরুণ দশ দিশি,
নীরব আঁধার নিশি,
দূর শুধু ভরপুর বেদন গানে—
কোথা কোন্ অভিমানী অশ্রু হানে !

কিবা কোন বিরহের ক্লিষ্টা বধু
বিরহ আঁধার ঠেলি লভেছে মধু ;—
আনন্দের আঁখি জল
বহি যায় ছল ছল,
আনন্দে বেদনে কাঁপে হৃদয় শুধু।
বাদল করেছে মাৎ ক্লিষ্টা বধু।

কিবা কোন চপলার হাসি ফোয়ারা !
এসেছে বাদল সনে হ'তে জিয়ারা* ;
হা-হা-হা-হা হানে রোল,
ঝম্-ঝম্ ঝিঁ-ঝিঁ বোল—
ঝলক খেলিয়া যায় হৃদি মাতোয়ারা ;
সে যে কোন চপলার হাসি ফোয়ারা !

কিবা কোন করুণার মূর্ত্তি নিধি,
উছলিছে করুণার মূর্ত্ত নদী।
তপন তাপিত ধরা
ছিল সে প্রখর খরা,
শীতলিছে তাই কিরে তপ্ত হৃদি,
সে যে কোন করুণার মূর্ত্তি নিধি !

কিবা কোন পিয়াসীর ভিস্তি বঁধু,
খুলিদেছে মসকের সলিল মধু,
ব্যাকুল পিয়াসা আর—
তৃপ্তির নিয়ে ভার
এসেছে বাদল আজ ধরায় শুধু ;
খুলি দিয়ে মসকের সলিল মধু।

কিবা কোন ভক্তের আবেকওসর, †
ভক্তির উপহার বাহি তর-তর,
পুণ্য প্রসাদ তার
লভে ধরাবাসী সার।
ভক্তির উপহার বাহি তর-তর,
ধরায় আসিল নামি আবেকওসর।

কিবা কোন চাতকীর প্রাণ পিয়ারা,
ছুড়ি দেয় ফটিকেরজল ফোয়ারা ;
ফটিক ফটিক জল,
কোথা আর কোলাহল,
তৃপ্তিতে সুশীতল বুঝি জিয়ারা ;
কোথা তুমি চাতকীর প্রাণ পিয়ারা ?

---

* জিয়ারা—হৃদয়।

† আবেকওসর—মন্দাকিনীর জল।

কিবা কোন সাকীয়ার* সুরা পেয়ালা,
লভে কোন হাহাকারী বঁধু-মাতোলা ;
আবেশেতে কম্পিত
উছলিয়া শঙ্কিত—
ঝর-ঝর ঝরে সুরা সনে বাদলা ;
সে যে কোন সাকীয়ার বঁধু মাতোলা !

"যেরূপে আসিবি আয় বাদল বঁধু,
হিয়ায় হইবে মোর সকলি মধু.
আঁখিনীর সুখ হাসি
সকলি সমান বাসি, .
নিশীথ রাতের এই বাদলে শুধু
হিয়ায় হইবে মোর সকলি মধু।

শেখ যোজেশ্বর হোসেন।

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বনাথ দর্শন

১

বিশ্বেশ্বর মেহেরপুর মুন্সেফী আদালতের অফিস পিওন—অর্থাৎ হাকিম বাবুর পাচক ব্রাহ্মণ। অল্পকাল হইল সে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে! বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বে যে অফিস-পিওন ছিল সে ছিল জাতিতে কৈবর্ত্ত। সুতরাং তাহার দ্বারা অফিসের কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য হইবার উপায় ছিল না। পরন্ত এতদঞ্চলের লোক সাহস করিয়া হাকিম হুকুমের বাড়ী পাচকবৃত্তি অবলম্বন করিতে সহসা রাজিও হয় না। বর্ত্তমান মুন্সেফ কালিপদ বাবু একটু চড়া মেজাজের লোক ; এই ওজুহাতে মেহেরপুর একরূপ পাচক শূন্য হইয়া পড়িল। যদি বা দু'একজন জুটিল তাহারা দু'একদিন কার্য্য করিয়াই চাকরীতে ইস্তফা দিল। এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েকজন পাচক যখন কিছু না কিছু লইয়া প্রস্থান করিয়া হাকিমবাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিল তখন নূতন লোক যোগাড় করিতে নাজির বাবুর প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। এ হেন সঙ্কট সময়ে স্বয়ং ভগবান এক সদুপায় করিয়া দিলেন। হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে বৃদ্ধ অফিস পিওনটী তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া পরপারে চলিয়া গেল।

অফিসের আমলাগণ একযোগে পরামর্শ দিলেন—এইবার এইকার্য্যে একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিয়োগ করিলে সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। হাকিমদের এই অভাবটার সহজেই নিবারণ হইবে। ভাগ্যক্রমে বিশ্বেশ্বর আসিয়া জুটিয়া গেল। গরীবের ছেলে সে। অনেক জায়গায় পাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। কেহ বেতন দেয় নাই,

* সাকীয়ারা—সুরা পরিবেশনকারিণী

কেহবা কিছু দিয়াছে, আবার কেহবা নানা অপবাদ দিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে। অসহায় নিঃস্ব বেচারী এ সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। এইবার ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিনায়াসে তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কালিপদ বাবুও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মস্ত এক অসুবিধা দূর হইয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভুর মনোরঞ্জন করিতে ক্রটী করিল না। এইরূপে ছয় মাস চলিয়া গেল। দুর্দ্ধর্ষ কালিপদবাবুও বিশ্বেশ্বরের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পরিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর ছোকড়াও বড় ভাল। মেহেরপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে তাহার বাড়ী। বাড়ীতে তাহার মা ও দুইটী ছোট ভাই বোন ভিন্ন অন্য কেহ নাই। দারিদের তাড়নায় অন্ন সংস্থানের জন্য তাহাকে নানা স্থানে ছুটিতে হইয়াছে। সামান্য পৈতৃক বিষয়ে কোন রকমে চাউলের সংস্থানটী হয়। তাহাতেই অতিকষ্টে জননী শিশু সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে ছিলেন। কিন্তু কয়েকবার অজন্মা হওয়ায় তিনি আর পারিলেন না, কাজেই বিশ্বেশ্বরকে স্কুল ত্যাগ করিয়া চাকরীর অন্বেষণে ছুটিতে হয়। কিন্তু তাহার মত বিদ্যার ছেলেকে চাকরী দেয় কে? অগত্যা তাহাকে পাচকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

নূতন চাকরী পাইয়া বিশ্বেশ্বর একবারমাত্র দুইদিনের জন্য তাহার জননীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। ছুটী ফুরাইলে ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হওয়ায় কালিপদবাবু তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন; কারণ এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব পাচকগণ দুদিনের স্থানে দুই মাস করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বেশ্বর কালিপদ বাবুর প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি নিজেই বিশ্বেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ বিশ্বেশ্বর, ছেলেমানুষ তুমি, তোমার বোধশক্তি এখনও অনেক কম। সংসারের কিছুই জান না। বাড়ীতে বৃদ্ধা জননী যখন আছেন, তাঁহার নিকট কিছু পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। বাকীটা তুমি আমার নিকট রেখে দিও। বুঝলে?

বিশ্বেশ্বর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহার নিকট সঞ্চিত যে ২০ টাকা ছিল তাহা কালিপদ বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিল। তাহার পর প্রতি-মাসেই বেতনের ১৬টী করিয়া টাকাই কালিপদ বাবুর নিকট রাখিতে লাগিল। জননী টাকা চাহিয়া পত্র দিলে, সে পত্র কালিপদ বাবুকে দেখাইয়া আবশ্যক মত টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিত।

এইরূপে বিশ্বেশ্বরের চাকরি জীবন বেশ চলিতে লাগিল।

২

এবার পূজার বন্ধে কালিপদবাবু সপরিবারে কাশীবাস করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু

বিশ্বেশ্বর না হইলে বিশ্বনাথ দর্শন বৃথা হইয়া যায়; কারণ তাহার মত বিশ্বাসী লোক বিনা, বিদেশ ভ্রমন বৃথা। অতএব কালিপদ বাবু নাছোড়বান্দা হইয়া বিশ্বেশ্বরকে ধরিয়া বসিলেন। জননীকে ছাড়িয়া বিশ্বনাথ দর্শনে বিশ্বেশ্বরের মন কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না। কিন্তু গিন্নিমা যখন ধরিয়া বসিলেন, বিশ্বেশ্বর তখন আর না বলিতে পারিল না। জননীর নিকট খরচের টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিল—"হাকিম নাছোড় হইয়া ধরায় এবার পূজার ছুটীতে আমাকে কাশী যাইতে হইল। আপনি সাবধান মত থাকিবেন। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

বিশ্বেশ্বর সম্মত হওয়ায় কালিপদ বাবুর আরও ৫।৭ জন সঙ্গী জুটিয়া গেল। কলিকাতা হইতে তাঁহার বন্ধু সস্ত্রীক এবং আরও ২।৪ জন আত্মীয় আসিয়া তাঁহাদের এ পূজার আমোদে ভাগ বসাইলেন।

৩

বিশ্বেশ্বর আজ ছুটী পাইয়াছে। বিশ্বনাথ আজ তাহার প্রতি সদয় হইয়াছেন। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভুসেবা করিয়া, বিশ্বনাথ দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রাতকৃত্য সারিয়া লইতে হয়। তারপর প্রভুদের চায়ের বন্দোবস্ত। তাহার পরই স্নানাদি সারিয়া রান্নার যোগার। আহারাদি শেষ করিতে প্রায় ২টা বাজিয়া যায়। তাহার পর ৪টা বাজিতে না বাজিতে বৈকালিক জলযোগ ও চা পানের চাপানেই বেচারীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর আবার নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা ত আছেই। এতদ্ব্যতিত বাসায় পাহারা দেওয়ার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত, কাজেই বিশ্বনাথ দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

আজ সে গিন্নিমাকে ধরিয়া বহুকষ্টে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত বিশ্বনাথ দর্শনের ছুটী পাইয়াছে। সে প্রাণ ভরিয়া ভক্তিরসাপ্লুত নয়নে বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া লইতেছে--

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকরোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রাকৃতিবসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

৪

তাহার পর তিনমাস চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের জননী টাকা পাঠাইবার জন্য তাগিদ দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন। জমিদার খাজনার জন্য অত্যন্ত তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে' এই হেতু অবিলম্বে অন্ততঃ পক্ষে ৩০৲ টাকা না পাঠাইলেই নয়।

পত্র পাইয়া বিশ্বেশ্বর একটু চিন্তিত হইল। কাশী যাওয়ায় তাহারও কিছু খরচ হইয়াছে। মাত্র ২৫টী টাকা মুন্সেফ বাবুর নিকট গচ্ছিত আছে। নাজির বাবুর নিকট সে শুনিয়াছে যে হাকিমের তহবিলেও টাকা নাই। অতএব এই বিদেশে কেইবা টাকা দেয়।

বহু চিন্তা করিয়া অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া বিশ্বেশ্বর গিন্নিমাকে ধরিল। তাহার টাকা কয়টী এবং আরও কিছু দিয়া জননীর প্রার্থিত টাকা কয়টী যেন হাকিম বাবুর নিকট হইতে লইয়া দেন।

বলা বাহুল্য বিশ্বেশ্বরের এ চাতুর্য্যটুকু নেহাত বিফল গেল না। যথাসময়ে কালিপদ বাবু বিশ্বেশ্বরকে আহ্বান করিলেন—"তোমার কত টাকার দরকার ?"

বিশ্বেশ্বর কালিপদ বাবুকে জননীর পত্রখানা দিল পত্র পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন—হাঁ—তা বুঝলাম টাকা তোমার খুব দরকার। কিন্তু তোমার গচ্ছিত টাকা আমার কাছে নাই। ২৫টী টাকা—তাইত তোমার কাশী যাতায়াতের ভাড়াতে ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা আমি নাজির বাবুকে বলে দিব। তার কাছ থেকে ৩০ টাকা নিও। আস্তে আস্তে শোধ করে দিও।

অবাক বিশ্বেশ্বর তখন কালিপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন—যাও টাকার জন্য ভেবো না। নাজির বাবুকে চাইলেই পাবে।

বিশ্বনাথের বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি তখন বিশ্বনাথের মানস পটে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সে নীরবে ধীরে ধীরে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

শ্রীসরোজ মোহন মজুমদার।

বিরহিণী

তুমি　বকুল বিটপীতল বেদিতে বসি,
'অয়ি!'　মলিন বদনা মরি প্রাবৃট শশী,
কেন,　কপোলে রাখিয়া কর নয়ন নীরে
আজি　ভাসিছ বিরলে বসি তটিনী তীরে।
অই　ছড়ায়ে পড়িয়া আছে কুসুম রাশি,
যত　বকুল চামেলি বেলা যুবতী হাসি,
পাশে　পরিয়া রয়েছে আধ গ্রথিত মালা,
কেন　বিরস বদনে বসি ভাসিছ বালা ?
বুঝি　বিতরি বিরহ প্রিয় গিয়াছে চলি,
শুধু　কোমল অমিয় মাখা বচনে ছলি,
তাই　বিরহ ব্যথিত চিত বকুল তলে,
ত্যজি　কুসুম, গাঁথিছ মালা নয়ন জলে।
শুনি,　মুনিরা দেখিয়া শুধু আনন রেখা
তারা　হেলায় পড়িতে পারে হৃদয় লেখা,
যদি　তাদের নয়নে কভু পড়িতে ধনি,
তবে　তোমার মনের কথা বলিত গণি,
তারা　বলিত গণিয়া তব জাগিছে মনে—
কোথা　গিয়াছ প্রাণেশ মোরে তেয়াগি বনে,
হায়,　তোমার এত কি প্রিয়, কঠিন হিয়া
সেথা　আমার মনের ব্যথা বাজে না গিয়া,

আমি দিবসে বসিয়া রহি তোমার লাগি
শুধু আশায় আশায় সারা রজনী জাগি,
মোর হৃদয় ছিঁড়িয়া পরে বেদনা ভারে
তবু, সেসুর বাজে না তব হৃদয় তারে,
এবে মনে কি পড়ে না গত বিলাস লীলা,
সেই চটুল-চরণা-চারু-তটিনী নীলা,
সেই শীতল ভ্রমর কাল বকুল-বেদি,
সেই বিকাল বিহার গিরি গগন ভেদি,
সেই কুসুম শোভনা প্রিয় বাগান বাটী
যথা আমোদে সতত নিশা যাইত কাটি।

সেই সোনার খাঁচায় পোরা মুখরা শারি,
সেই হরিণ শাবক দুটি কানন চারি,
সেই চাঁদের আলোকে কথা আপন ভোলা,
সেই মলয় অনিলে সুখে দোলায় দোলা,
সেই কথায় কথায় হাসি তামাসা রাশি
সেই নিয়ত নবীন বুলি 'ভাল যে বাসী'।
হায়, ভুলিয়া গিয়াছ প্রিয় সে সব কথা
নহে, আমায় সহিতে হয় দারুণ ব্যথা!
আর সহে না সহে না প্রিয় আইস ফিরি
দিব আমার যা কিছু আছে হৃদয় চিরি।

৺সৌরিশ চন্দ্র মৌলিক

জ্যোতিস্তত্ত্ব

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

পুরাকালে ত্রিকালদর্শী পূজনীয় আর্য্যঋষিগণ তপস্যালব্ধ ভূয়োদর্শনের বলে যে সমস্ত অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, জ্যোতিষ তন্মধ্যে অন্যতম। জ্যোতিষ ষড়ঙ্গ বেদের একটী অঙ্গ। ঋগ্বেদে জ্যোতিষের প্রথম সূত্রপাত হয়, তদনন্তর তাহার ক্রমবিকাশ হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে কোন প্রকার রচনার উল্লেখ বা মানব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। বেদ ভারতের নিজস্ব ধন, সুতরাং বলিতে গেলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই জ্যোতিষের আদি জন্মভূমি। হিন্দুগণের সৌভাগ্যের যুগে, ভারতবর্ষে এই শাস্ত্র বহুলভাবে আলোচিত হইয়া ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দি হইতে পাশ্চাত্য খণ্ডেও ইহা ক্রমশঃ আদৃত ও আলোচিত হইয়া, বর্ত্তমানে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এক এক জন ক্ষণজন্মা পাশ্চাত্য পণ্ডিত, জ্যোতিষের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, সৌরজগতের

কত অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার পূর্ব্বক, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন. আর হতভাগ্য আমরা, পিতৃপুরুষগণের তপস্যালব্ধ অমৃত ফল হেলায় পদদলিত করিয়া দুর্দ্দশার দুরপনেয় পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি।

প্রাচীনকালে এতদ্দেশে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎকালে দ্বিজ মাত্রেরই বেদ অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং জ্যোতিষও বেদেরই একটী অঙ্গ বলিয়া জ্যোতিষের আলোচনাও বিশেষভাবেই হইত। তদনন্তর সর্ব্বদা রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিধর্ম্মিগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ভারতবাসীকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। শাস্ত্রালোচনার নিশ্চিন্ত অবকাশ বা সুযোগ বড় একটা কেহ পাইতেন না। তৎকাল হইতে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষেরও চরম অবনতি ঘটিয়াছে। অধুনা একমাত্র কেরাণীগিরি-বিদ্যা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনা করা, আমরা সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করি। তবে সুখের বিষয় এক্ষণে এতদ্দেশীয় অনেক মনিষী ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যের প্রতি আস্থাবান হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তদনুসারে জ্যোতিষের আলোচনাও যৎকিঞ্চিৎ হইতেছে। জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চা, এক্ষণে কোন সম্প্রদায় বিশেষের একায়ত্ত অধিকার বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। আত্মহিতকামী, যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও আগ্রহানুসারে যে কোন শাস্ত্রের আলোচনা করিবার অধিকারী। জ্যোতিষের ন্যায় দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া, যদিও পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের প্রয়াসের ন্যায় বাতুলতা মাত্র, তথাপি শাস্ত্রালোচনা করা মনুষ্য মাত্রেরই জন্মগত অধিকার বিবেচনায়, সুধিগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন আশায়, এবিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম।

জগতে চেতন অচেতন আদি যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই সূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রভাবে প্রভাবিত ও তাহাদের অদৃশ্য শক্তির অধিন। ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই কতক কতক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে ঋতু পরিবর্ত্তন এবং চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে। ঋতু ও তিথি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানব শরীরেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানব শরীরে চন্দ্র সূর্য্যের প্রভাব নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্রূপ অন্যান্য গ্রহগণও মানব শরীরে অল্পাধিক পরিমাণে শক্তি সঞ্চালন করিয়া থাকে। জন্ম, জরা, মৃত্যু, অভ্যুদয়, পতন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমুদয় পরিবর্ত্তনই গ্রহগণের প্রভাবে সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সহজে সাধারণের প্রতীয়মান হয় না। জাগতিক সকল বিষয়ই অন্বয়মুখী প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, ব্যতিরেকী প্রমাণ দ্বারাও অনেক বিষয়ের উপলব্ধি করিতে হয়। আমাদের এই আলোচ্য বিষয়টী ব্যতিরেকী প্রমাণের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গ্রহগণের সংস্থান ও সংযোগ

অনুসারে কিরূপ ফল হয় এবং মানবজীবনের উপর তাহার প্রভাব কতদূর, তাহা মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা নির্ণয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া, অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বিফলান্যন্য শাস্ত্রানি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।

এক্ষণে সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই উচ্চ-শিক্ষিতের কথা দূরে থাক, সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও ঋষিবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

যে শাস্ত্রদ্বারা গ্রহগণের গতি ও মানব জীবনের উপর তাহার প্রভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই জ্যোতিষ শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ গণিত জ্যোতিষ Astronomy ও ফলিত জ্যোতিষ Astrology এই দুই ভাগে বিভক্ত।

গণিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির আকার, গতি এবং পরস্পরের দূরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়-গুলি গণনা করা যায়। ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহগণের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে কার্য্যের শুভাশুভ ফল এবং মানব অদৃষ্টের, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সকল জানিতে পারা যায়। প্রশ্ন গণনা, ঝড় বৃষ্টি গণনা এবং রাষ্ট্রবিপ্লব গণনা প্রভৃতিও এই ফলিত জ্যোতিষেরই অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক আত্ম-হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি মাত্রেরই, এই মহোপকারী অভ্রান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সহজলভ্য ও সহজবোধ্য উপযুক্ত পুস্তক বা উপদেষ্টার অভাবে, অনেকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না।

সকলে যাহাতে সহজে আপনাপন জীবনের শুভাশুভ বা আপনাপন পুত্র কন্যা বা আত্মীয় স্বজনের জন্য পত্রিকা প্রস্তুত করতঃ তাহাদের জীবনের শুভাশুভ বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কতকগুলি সহজ উপায় আমরা ক্রমশঃ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহার কয়েকটী সংজ্ঞা আয়ত্ত করা আবশ্যক, নিম্নে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

সংজ্ঞাপ্রকরণ।

১। বিষুবরেখা বা নিরক্ষ বৃত্ত।—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে সমদূরবর্ত্তী স্থান দিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটী গোলাকার রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই কল্পিত রেখাকেই বিষুব রেখা বলে। এই কল্পিত রেখা হইতে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী স্থান সকলের অক্ষসংখ্যা বা দূরত্ব নির্ণয় হয়, এই কারণে ইহার নিজের অক্ষসংখ্যা নাই বলিয়া ইহাকে নিরক্ষ বৃহত্তর ও বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় আকাশ মণ্ডলের মধ্যভাগেও পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ঐরূপ একটী গোলাকার রেখা কল্পিত হইয়া থাকে, ইহাকেও বিষুব রেখা বলে।

২। রবিমার্গ ও রাশিচক্র। নিরক্ষবৃত্তের উপর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত—পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত যে বৃত্তাভাসকার গোলাকার রেখা পৃথিবী বা আকাশমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাকেই রবিমার্গ বা সূর্য্যের গমন পথ বলা হয়। কিন্তু সূর্য্য নিশ্চল, প্রকৃতপক্ষে এই পথে পৃথিবীর বার্ষিক গতিক্রিয়া সমাধা হয়, ইহাই পৃথিবীর কক্ষ। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীকে নিশ্চল ও সূর্য্যকে সচল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে মাত্র। এই রবিমার্গে বিষুবরেখার উত্তর দিকে মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ছয়টী ও দক্ষিণ দিকে তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত ছয়টী রাশি তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত এইজন্য ইহাকে রাশিচক্রও বলে।

৩। অয়ন।—অয়ন অর্থে গতি। গ্রহগণ রাশিচক্রে নিয়ত বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহাদিগের এই পরিভ্রমণকে অয়ন বলে।

৪। দিক্‌চক্র বা ক্ষিতিজ রেখা।—আমাদের চতুর্দ্দিকে যে পরিদৃশ্যমান বৃত্ত অনুভব করা যায় অর্থাৎ যে স্থলে পৃথিবী এবং আকাশ মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাকেই দিক্‌চক্র বা চক্রবাল বা ক্ষিতিজ রেখা বলে।

৫। লগ্ন —মেষাদি দ্বাদশরাশির উদয়কে দ্বাদশ লগ্ন বলে। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। কোন রাশি বা লগ্নের উদয় হইতে তৎপরবর্ত্তী রাশি বা লগ্নের উদয়কালকে পূর্ব্বোদিত রাশির লগ্নমান বলে।

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে একবার আপনার কক্ষে আবর্ত্তন করে। এই আবর্ত্তনকে পৃথিবীর আহ্নিকগতি বলে। এই আহ্নিকগতি বশতঃ পৃথিবী যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশটী রাশি অতিক্রম করে সুতরাং একরাশি অতিক্রম করিতে ইহার দুই ঘণ্টা বা ৫ দণ্ড সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় সকল রাশির লগ্নমান সমান হয় না। কারণ রবিমার্গ বা রাশিচক্র পথ সম্পূর্ণ গোল নহে, একটী বাগানের আকৃতি যেরূপ সেইরূপ বৃত্তাভাসাকর এবং এই কারণেই লগ্নমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৬। উদয়লগ্ন ও অস্তলগ্ন।—সূর্য্যের উদয়-কালে পূর্ব্বাকাশে যে লগ্নের উদয় হয় তাহাকে উদয়লগ্ন ও সূর্য্যের অস্তগমনকালে পূর্ব্বাকাশে যে লগ্নের প্রকাশ পায় তাহাকে অস্তলগ্ন বলে। দিবসে জন্ম হইলে উদয়লগ্ন ও রাত্রে জন্ম হইলে অস্তলগ্ন অনুসারে গণনা করিতে হয়।

৭। রবিভুক্তি।—সমস্ত রাশিচক্রের পরিমাণ ৩৬০ ডিক্রী বা অংশ। রাশি সংখ্যা ১২। উক্ত ৩৬০ ডিক্রীকে ১২ অংশে ভাগ করিলে প্রত্যেক অংশে ৩০ ডিক্রী হয় সুতরাং প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিক্রী বা অংশ। রবি এক এক মাসে এক এক রাশিতে অবস্থান করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন। সূর্য্য যে রাশিতে উদিত হন, সেই রাশি হইতে গণনা করিয়া তাহার সপ্তম রাশিতে অস্তমিত হন, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদয় ও মেষ হইতে সপ্তম রাশি তুলায় অস্ত হন। এইরূপ পর পর

যথাক্রমে হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রতিদিন রাশির এক এক অংশ অতিক্রম করিয়া ৩০দিনে ৩০অংশ অতিক্রম করতঃ অন্য রাশিতে গমন করেন। এই প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতে সূর্য্যের যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয় তাহাকেই সূর্য্যের দৈনিক রবিভূক্তি বলে। উদয় লগ্নের রবিভূক্তিকে উদয় রবিভূক্তি ও অস্তলগ্নের রবিভূক্তিকে অস্ত-রবিভূক্তি বলে।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার।

কে ঐ চাঁদ ?

জ্যোৎস্না ধৌত ধরার বক্ষে
স্তব্ধ প্রকৃতি মুগ্ধ প্রায়,
সুপ্ত সকলে আপন কক্ষে,
পক্ষীরা সব কি গান গায়!
গঙ্গার নাই নিদ্রা নয়নে,
লুপ্ত গরিমা গাহিয়া যায়,
স্পন্দ-বিহীন পাদপ সকল
উদাস পরাণে আকাশে চায়!

স্ফুট কুসুমের সুগন্ধ বিভব
লুটিয়া লইয়া পবন আজ,
ধীরে বিতরিছে সমান করিয়া
ধনী নির্দ্ধন সবার মাঝ।
এহেন নিশীথে নদীয়ার বুক
আলো করে যায় কে ঐ চাঁদ ?
আবেশে বিবশ আঁখি ঢুলু ঢুলু
অঙ্গে জড়ান প্রেমের ফাঁদ!

শ্রীচিত্ততোষ বাগচী।

কাছারী প্রাঙ্গণে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

পুলিশের তদন্ত পুরাদমে চলিতে লাগিল। তদন্তে প্রকাশ পাইল Mr. Williams মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়াছিল "Mr. H. M. V. Viks" যাহারা কাছে ছিল তাহারা বুঝিল Mr. Hendrikes. যে সব সাক্ষি ঘটনার পর উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই বলিল

গোলমাল শুনিয়া আসিয়া দেখে Mr. Williams মাটিতে পড়িয়া আছে. Hendirkes তাহার উপরে ঝুকিয়াছিল এবং রক্তাক্ত ছোরাসমেত তাহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলে. তৎপর আসামী পলাইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। Mr. Hendirkes বা Williams কে কেহ তাহারা চেনে না। এবং ঘটনার কারণ অথবা কি লইয়া গোলমাল প্রথম উপস্থিত হয় তাহা কেহ বলিতে পারিল না। রেল আফিসের খাতা পত্রে প্রমাণ পেল Mr. Hendrikes এর পদের নাম Claims Superintendent এবং Mr. Rodriques ও Williams দুই জন গার্ড ঘটনার দিন এক জনের তিনটার সময় ও আর একজনের চারিটার সময় off duty হইয়াছিল। ষ্টেশনের নিকট একটি বড় বাজার, সেখানে একজনের Shortweight হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাকে open delivery দেওয়া হইয়াছিল। সে দোকানদার কোম্পানির নামে মোকদ্দমার নোটিশ জারী করাতে Mr. Hendrikes তদন্ত করিতে এবং আপোষ নিষ্পত্তি করিতে সেখানে এসেছিলেন। গার্ড দুইজনের সঙ্গে তিনি যে পূর্ব্বে অপরিচিত ছিলেন তাহা বলা যায় না। তাহাদের সঙ্গে যে বিশেষ হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও প্রকাশ পাইল না; ঘটনার পূর্ব্বে Mr williams কোথায় কি ভাবে ছিলেন তাহা জানা গেল না তবে running room এর চাপরাশি বলিল তিনটার গাড়ীর পর Mr. Williams সেখানে আসেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে একটি অপরিচিত সাহেব সেখানে আসিয়া গল্প আরম্ভ করে। এবং দুইজনেই সেখান হইতে চলিয়া যায়। যেখানে ঘটনা হইয়াছিল তাহার আশেপাশে কোন ঘর বাড়ী নাই। বাজার হইতে সাহেব মহালের যাওয়ার রাস্তার উপর নিকটে একটি বটগাছ আছে এবং বাজার প্রায় ৩০০ হাত দূরে। সাহেবদের লোক ভিন্ন বড় কেহ সে রাস্তায় চলাফেরা করে না! Mr. Rodriques অথবা Williams কেহ এখানে থাকেন না। Railway Station এ কয়েক ঘণ্টা off duty র পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যান। Running roomয়েই খাওয়া দাওয়ার ও শয়নের বন্দোবস্ত আছে। সেখানেই তাহারা মধ্যে মধ্যে বাস করিত। Running room এ বন্ধুদের থাকিতেও কোন আপত্তি ছিল না; সেখানে কোন খাতাপত্র থাকে না যাহাতে বোঝা যাইতে পারে কে কোন সময় সেখানে ছিল। খানসামা সুধু প্রত্যহ খাওয়ার "টোকা" রাখে এবং যে যখন খায় তাহার সহি করাইয়া লয়। Mr. Hendrikesকে জেলখানাতে পুলিশ আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কিন্তু তিনি সুধু বলিলেন "I am absolutely innocent of this affair I can not say why Mr. Williams was killed" Mr. Hendrikes এর চরিত্র সম্বন্ধে এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহাতে Williams এর সঙ্গে তাঁহার সামান্য মনোমালিন্যের কারণ অনুমান করা যেতে পারে। তদন্ত যখন এ পর্য্যন্ত হইল তখন S.P. তদন্তকারী দারগা Inspector ও Dy S.P. কে তলপ দিয়া জেলায় লইয়া গেলেন; সেখানে তাহাদের একটি con-

ference হইল তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথা-বার্ত্তা হইল। (এখানে বলিয়া রাখি পাঠক ভুলিবেন না আমি মোক্তার, আমার সর্ব্বত্র গতি-বিধি থাকা অসম্ভব নয়। যদি জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে আমি এসব কথাবার্ত্তা জানিলাম তবে আমি শুধু এখানে এই মাত্র বলিতে পারি যে সে conference এ S. P. মহাশয়ের reader উপস্থিত ছিলেন এবং reader নামীয় জীব না থাকিলে S. P. মহাশয়ের কাজ কর্ম্ম করা কঠিন)

(ক্রমশঃ)

শ্রীলতিকা দেবী।

ঘর ও বাহির

কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের বেশ্যাদের গৃহে অনেক অল্পবয়স্কা বালিকা আছে, যাহাদিগকে পালিকারা পাপব্যবসায়ের জন্য রাখিয়াছে। কুস্থান হইতে এইসব বালিকাদের উদ্ধারসাধন করিবার ক্ষমতা পুলিসের আছে। কিন্তু উদ্ধার করিয়া রাখিবার জায়গা যথেষ্ট নাই। এইরূপ বালিকাদের বিবাহ মুসলমান সমাজে ও খৃষ্টীয় সমাজে হইতে পারে; কিন্তু হিন্দু সমাজে সচরাচর হয় না,—হইতে পারে না বলিতে পারি না। যাহা হউক, ইহাদের যাহাতে সুশিক্ষা ও সদুপায়ে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উচিত। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যই সকলের চেয়ে কঠিন, কারণ, ভদ্র হিন্দু-সমাজে এইরূপ বালিকাদের স্থান পাওয়া কঠিনতম।

এইরূপ বালিকা ছাড়া, যে-সব হিন্দু কুমারী, সধবা বা বিধবা ধর্ষিতা হন, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করেন কিম্বা যদি এইরূপ কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য ও সুপরিচালিত আশ্রমের প্রয়োজন আছে। তাহার জন্য হিন্দু-সমাজকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তদভাবে অগত্যা যদি ধর্ষিতা নারীরা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের লোক-দের চীৎকার করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহাদের কেহ কেহ যে বেশ্যাশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন, তাহাতে হৈ চৈ পড়ে না।

এইরূপ একটি আশ্রমের জন্য কলিকাতা মেয়র যে একটি ফণ্ড খুলিয়াছেন, দলাদলি ভুলিয়া এবং তিনি আগে কেন এরূপ কিছু করেন নাই, এবম্বিধ আপত্তি না তুলিয়া, তাহাতে সকলের যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য।

প্রবাসী—বৈশাখ।

নেপালী যুবক খড়্গা বাহাদুর সিংহের ৮ বৎসর কারাদণ্ডে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহার মুক্তির জন্য বহু প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারের শীর্ষস্থানীয়ের নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে তাহার দণ্ডবিধানে সকলেই দুঃখিত, তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ, তাহার মঙ্গলার্থে সকলেই ব্যগ্র। কেন এমন হয়?

খড়্গা বাহাদুর খুনী আসামী; সে নরহত্যার অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। যদিও বিচারকালে সে অপরাধে তাহার দণ্ড হয় নাই, তথাপি তাহার আত্মমুখে স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে নরহত্যাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এমন লোক সমাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তবে আজ তাহার জন্য আপামর সাধারণ--বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ কেন?

এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থার কথাটাও খুনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

রাজকুমারী মায়া পঞ্চদশবর্ষীয়া নেপালী বালিকা, সে বর্ত্তমান নেপাল-রাজবংশের সহিত দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া শুনা গিয়াছে। যাহাই হউক, সে সুন্দরী যুবতী; সুতরাং পশুপ্রবৃত্তি নররাক্ষসের দৃষ্টিতে যে তাহার রূপই কালস্বরূপ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। নানা চক্রান্তের ফলে সে তাহার জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয়স্বজন তাহাকে অর্থ-বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল, কি দুষ্ট শয়তান 'যুবতীর আড়কাঠি' তাহাকে বিলাসী ধনীর কাম লালসায় আহুতি দিবার জন্য নানা ছলে ভুলাইয়া আনিয়াছিল, সে কথার আলোচনা করিব না। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সেই বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কলিকাতার বড়বাজারে এক কামুক লম্পট ধনী ব্যবসাদারের কবলে অর্পণ করা হইয়াছিল—তাহার নাম হীরালাল আগরওয়ালা। এই কামান্ধ মাড়োয়ারী পরিণতবয়স্ক, রাজকুমারী মায়ার পিতামহ হইবার উপযুক্ত, উহার একাধিক পত্নী বর্ত্তমান।

ইহার গৃহে পশুবলে রাজকুমারী মায়ার সর্ব্বনাশসাধন করা হইয়াছিল। হীরালাল একা নহে, কয়জন সঙ্গী সহ তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। নিখিল ভারতীয় গুর্খা লীগের সভাপতি ঠাকুর চন্দন সিংহ কোনও সংবাদ-সংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, বালিকার উপর এমন পাশবিক ও অস্বাভাবিক অত্যাচার হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করিতে লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব হয়!

খড়্গা বাহাদুর সিংহ মাত্র একবিংশতিবর্ষীয় বালক। সে উচ্চবংশ জাত, শিক্ষিত, গুর্খা লীগের সম্পাদক। সে সম্মানের সহিত বি, এ, অবধি পাশ করিয়া গিয়াছে, পরন্তু নেপালের রজবংশের সহিত সে-ও দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত। সে যখন শুনিল, একটি অসহায়া নিষ্পাপা সরলা নেপালী বালিকার উপর এই অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, পরন্তু সেই বালিকা নেপালের রাজবংশের

সহিত সম্পর্কিত, তখন তাহার হৃদয়ের শোনিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। নেপালীরা অত্যন্ত রাজভক্ত, এ জন্য রাজকুমারী মায়ার অপমানে সে রাজবংশের অপমান বলিয়া মনে করিল। পরন্তু সে স্বয়ং রাজবংশীয়, সেই হিসাবে রাজকুমারী মায়াকে সে ভগিনী বলিয়া মনে করিল। সর্ব্বোপরি নারীর মর্য্যাদাহানিতে সে একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে জানিত, এক শ্রেণীর ধনী লম্পট এই সহরে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে অর্থ ও লোকবলের সহায়তায় এইরূপ অসংখ্য অসহায়া বালিকার সর্ব্বনাশসাধন করে; অথচ এ অবস্থার প্রতিকার নাই! অর্থবলে তাহারা আপনাদিগকে নিরাপদ রাখে। রাজকুমারী মায়ার ব্যাপারেও এইরূপ হইয়াছিল। সে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া পুলিসের ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু সে পত্র যথাস্থানে পেঁাছিয়াছিল কি না, জানিতে পারে নাই। সে বহুবার পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৃতকার্য্য হয় নাই। শেষে যখন সমর্থ হইয়াছিল, তখনও পুলিস তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। সে যখন দারুণ অত্যাচারের ফলে হাঁসপাতালে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়াছিল, তখন তাহাকে সেই অবস্থায় খড়্গ বাহাদুর দেখিয়াছিল; তাহার পর তাহার মুখে তাহার উপর এই অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়াছিল। ইহার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

তাই সে সেই বালিকার উৎপীড়ক লম্পট হীরালালের দণ্ডের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। সে জানিত রাজসরকার ব্যতীত অপর কাহারও দোষীর দণ্ডবিধানের অধিকার নাই, রাজ আইন এই কথা বলে। কিন্তু সে যখন বুঝিয়াছিল, এই শ্রেণীর অপরাধীর প্রকৃত বিচার রাজ সরকারে হইবার উপায় নাই, তখন সে আইন মানে নাই। তাহার ধারণা হইয়াছিল, এইরূপ লম্পটের দণ্ডবিধান করিলে, আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু নীতি ধর্ম্মের দৃষ্টিতে হইবে না।

তাহার স্বীকারোক্তিতে এ কথা স্বপ্রকাশ। হাইকোর্ট বিচারকালে সে স্বীকারোক্তিতে হীরালালকে হত্যা করিবার কথা একবারও অস্বীকার করেন নাই; নির্ভিকভাবে সত্য কথা বলিয়া গিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, সে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া হীরালালের আফিসে গিয়াছিল এবং তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। আর বলিয়াছিল,—

"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমি আইনতঃ বা ন্যায়তঃ (এই হত্যা করিয়া) কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই। কিন্তু যদি আপনি (বিচারক) এবং জুরিগণ মনে করেন যে, আমার ভগিনীর সম্মান এবং সতীত্ব রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল না, —যদি আপনারা মনে করেন যে, আমি হীরালালের অপেক্ষা সরকারের অথবা গার্হস্থ্য সুখ-শান্তির পক্ষে অধিক বিপজ্জনক, তাহা হইলে আমি আমার কৃত কর্ম্মের জন্য পূর্ণ দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।" খড়্গ বাহাদুর আরও বলিয়াছিল যে, সে মহাত্মা গান্ধির অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল,

সে নিরামিষাশী ছিল, স্বপ্নেও কখন প্রাণিহিংসা করিবে বলিয়া মনে করে নাই। কেবল অবস্থাতেই তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন. কি ভীষণ নারী-নিগ্রহের ফলে তাহার এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল!

খড়্গা বাহাদুরের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়া সমাজের অঙ্গ হইতে একটা কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল,—"কলিকাতায় ও অন্যত্র সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ধনী আছে, যাহাদের বিরুদ্ধে সামান্য সন্দেহ কাহারও মনে সঞ্জাত হইতে পারে না, অথচ তাহারাই হীরালালের শ্রেণীর লোক।"

এ কথাটা সমাজের পক্ষে ভাবিয়া দেখিবার। এই শ্রেণীর বহু 'হীরালালই' সমাজের বুকের উপর বসিয়া অর্থের জোরে সমাজের সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ কত নিষ্পাপ কুলনারীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। এমন লোকও সমাজে আছেন, যাঁহারা গোপনে বাবুর্চ্চি খানসামার হস্তের নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বারনারী গমন করেন, অথচ প্রকাশ্যে নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া প্রকাশ্য সভায় হিন্দু-কুলচূড়ামণি সাজিয়া সভাপতিরূপে হীনচাটুকারগণের হস্তে স্রক চন্দন ও মাল্য উপহার প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ সকল শ্রেণীর ভণ্ডকে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের তরুণগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। খড়্গা বাহাদুরের পবিত্র আত্মোৎসর্গের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগকে নারীর মর্য্যাদা-রক্ষায় অগ্রণী হইতে হইবে। সে জন্য আইন লঙ্ঘন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্য, ভণ্ড পাষণ্ড লম্পটের মুখের মুখোস খুলিয়া দেওয়া। পরন্তু বাঙ্গালার মফঃস্বলে হিন্দু নারী-নির্য্যাতনের বিষয়েও তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মাতৃজাতির অমর্য্যাদায় জাতির কলঙ্ক। যে ক্লীব, সে মাতৃ-জাতির—জননী-ভগিনী দুহিতা পত্নির মর্য্যাদানাশ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে। দেশের তরুণগণ জাতির স্কন্ধে সে কলঙ্কের ভার চাপাইতে কখন সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদর বিশ্বাস।

বসুমতী—চৈত্র।

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি—

১। প্রতি মাসের শেষে 'অরুণা' প্রকাশিত হয়।

২। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। বাৎসরিক মূল্য ১৷৹ টাকা ও নগদ মূল্য ⁄১৫।

৩। যথাসময়ে পত্রিকা না পাইলে, দশ দিনের মধ্যে কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। সময়ে অনুসন্ধান না হইলে প্রতিবিধান করা সম্ভবপর নহে।

৪। পূর্ব্ব ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে জানান আবশ্যক।

৫। পত্রিকাসম্বন্ধে পত্রাদি 'কার্য্যাধ্যক্ষ অরুণা' ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

৬। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না।

৭। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ পত্রাদি লিখিবার কালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

লেখকগণের প্রতি—

১। উদীয়মান লেখক লেখিকার প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হয়

২। কাগজের এক পৃষ্ঠায় অতি স্পষ্টভাবে প্রবন্ধাদি লেখা বাঞ্ছনীয়।

৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধাদি ছাপাইতে সম্পাদক অসমর্থ।

৪। প্রবন্ধাদি 'সম্পাদক অরুণা' ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

৫। প্রবন্ধাদি লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হয়।

৬। প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ডাক টিকিট না দিলে ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রতি—

১।	সাধারণ এক পৃষ্ঠা এক বৎসরের জন্য	...	...	...	১৫৲
২।	„ আধ পৃষ্ঠা „	...	...	...	৯৲
৩।	„ সিকি পৃষ্ঠা „	...	...	...	৫৲
৪।	„ এক পৃষ্ঠা ছয় মাসের জন্য	...	...	...	১০৲
৫।	„ আধ পৃষ্ঠা „	...	...	...	৬৲
৬।	„ সিকি পৃষ্ঠা „	...	...	...	৩৲

দ্রষ্টব্য—কভার পেজে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অনুসন্ধান আবশ্যক।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রী শ্রীশচন্দ্র সরকার,
অরুণা কার্য্যালয়।
নিমতিতা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা

Printed and Published by K. P. Sarkar at the Gobinda Press, Nimtita (Murshidabad).